ভূমির
মালিকানা
বিধান
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ভূমির মালিকানা বিধান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ : এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ১৮৮

১ম সংস্করণ

জমাদিউস্‌সানী	১৪১৪
অগ্রহায়ণ	১৪০০
ডিসেম্বর	১৯৯৩

বিনিময় ঃ সাদা-৩০.০০ টাকা
নিউজ-২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

مسئلہ ملکیت زمین -এর বাংলা অনুবাদ

BHOMER MALIKANA BEDHAN by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : w-Taka 30.00 only
N-Taka 20.00 only

সূচীপত্র

ভূমিকা

আজ থেকে পনের–ষোল বছর আগের কথা। একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকারের কলম থেকে কুরআন মজীদের শিক্ষার উপর একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থে অনেক উপকারী আলোচনার সাথে সাথে কতিপয় কথা আমার মতে ছিল সত্যের পরিপন্থী। আমি তর্জুমানুল কুরআনে এর উপর একটি বিশদ সমালোচনা লেখি যা ১৩৫৩ হিজরীর (১৯৩৪ খৃঃ) প্রথম দিকের তর্জুমানুল কুরআনের পাতায় প্রকাশিত হয়। অতপর এই সমালোচনা একটি বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয় এবং সামনে অগ্রসর হয়ে দেশের আর একজন খ্যাতনামা লেখক মূল লেখকের সাথে সুর মিলিয়ে বিতর্কে অংশ নেন। তর্জুমানুল কুরআনে এ আলোচনা দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে বহু বিষয় এ আলোচনার আওতায় এসে যায়। তার মধ্যে একটি বিষয় এই ছিল যে, জমির ব্যাপারে ইসলামী আইনের লক্ষ্য কি? ইসলাম কি জমি সামষ্টিক মালিকানায় আনতে চায় অথবা ব্যক্তিগত মালিকানাই কায়েম রাখতে চায়? যদি ব্যক্তি মালিকানাই বহাল রেখে দিতে চায় তাহলে কি মালিক নিজে চাষাবাদ করতে পারে এতটুকু পরিমাণের মধ্যে সীমিত রাখতে চায় অথবা বর্গা দেয়ারও অনুমতি দেয়?

এসব আলোচনা তর্জুমানুল কুরআনের ফাইলে বন্দী হয়ে পড়ে ছিল। এখন জেল জীবনের অবসর মুহূর্ত যখন আমাকে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ করে দিল। তখন পুরান কাগজ পত্রের মধ্যে এই আলোচনাটিও সামনে এলো। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির আলোচনা আগের চেয়েও এখন আরো বেশী প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়। কিন্তু সাথে সাথে আরো অনুভব করলাম যে, আজকের প্রয়োজনের জন্য আগের আলোচনাটি তৃষ্ণা মিটাতে যথেষ্ট নয়। যদি

সে আলোচনাটিই হুবহু প্রকাশ করা হয় তাহলে তা খুব বেশী কাজে আসবে না। তাই আমি ওটাকে পুনর্বার দেখলাম। যেখানে যেখানে শূন্যতা অনুভূত হলো তা পূর্ণ করলাম। এর সাথে আরো বেশ কিছু অধ্যায় সংযোজন করলাম যা আজকের মানুষের জন্য প্রয়োজন।

এই সংশোধন ও সংযোজনের পর এই সংক্ষিপ্ত বইটি পাঠকদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। এর শুধু প্রথম অধ্যায়টি (প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ) পূর্বের সেই আলোচনা যা তর্জুমানুল কুরআনের পাতায় অতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য অধ্যায়গুলো নতুন সংযোজন। আর আজকের জনগণের উদ্দেশ্যেই তা রচনা করা হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে নয়—যাঁদের সাথে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।

আবুল আ'লা
নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান।
৯ রবিউসসানী ১৩৬৯ হিজরী
২৯ জানুয়ারী ১৯৫০ খৃঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমির ব্যক্তি মালিকানা কুরআনের দৃষ্টিতে

যেমন ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এটা একটা বিতর্কমূলক আলোচনা। একটি বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়েই এ আলোচনার সূচনা। এই আলোচনায় নিম্নলিখিত দিকগুলো শামিল হয়েছে ঃ

(১) তর্জুমানুল কুরআনের সমালোচনা

(২) গ্রন্থকারের জবাব

(৩) তর্জুমানুল কুরআনের পক্ষ থেকে লেখকের জবাবের জবাব

(৪) জনৈক নিবন্ধকার কর্তৃক লেখককে সমর্থন

(৫) তর্জুমানুল কুরআনের শেষ জবাব

এখানে এই আলোচনা টেনে আনার উদ্দেশ্য যেহেতু কোন পুরানো বিতর্ককে চাংগা করা নয় তাই নাম উল্লেখ করা হলো না।

১

গ্রন্থকার[১] সূরা আর–রহমানের وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আয়াতটি থেকে এই বিধান বের করেছেন যে, ভূমির ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ জমিদারী প্রথা জায়েয নয়। অতএব তিনি পাদটীকায় লিখেছেন ঃ

> "কুরআনের যেখানে যেখানে ভূমির উত্তরাধিকার সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে বুঝানো হয়েছে, ব্যক্তি মালিকানা তথা জমিদারী বুঝানো হয়নি। জমি থেকে উপকৃত হবার অধিকার ছাড়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার অধিকার কুরআনে দান করেনি।"

এখানে টীকার উল্লেখিত মত গঠন করতে গিয়ে লেখক স্পষ্টত সত্যের সীমালংঘন করেছেন। তাঁর চিন্তা করার ছিল যে, কুরআন নাযিল হওয়ার

১. যাঁর লেখা পুস্তকের সমালোচনা করা হচ্ছে তাঁকে বুঝানো হয়েছে।

সময় গোটা পৃথিবীতেই জমির ব্যক্তি মালিকানা প্রথা প্রচলিত ছিল, শত শত বছর ধরে তা চলে আসছিল এবং তা তামাদ্দুনের বুনিয়াদী নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূমি হতে উপকৃত হওয়ার এ সুপ্রাচীন প্রথার আমূল পরিবর্তন করা এবং ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে জাতীয় মালিকানার পন্থা চালু করাই যদি প্রকৃত-পক্ষে কুরআনের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এরূপ বিপ্লবাত্মক মৌলিক পরিবর্তনের জন্য কি এরূপ প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট ছিল যা وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে? একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদী সংশোধনের জন্য শুধু ভাসা ভাসা ইঙ্গিত যথেষ্ট হতে পারে না, বরং সুস্পষ্ট বিধান দেয়ার প্রয়োজন হয়। আর এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য পূর্ব প্রথাকে বিলোপ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার মূলোৎপাটনের সাথে সাথে নিজের তরফ থেকে বিকল্প একটি নীতিমালাও পেশ করতে হয়। এখন জনাব গ্রন্থকার সাহেব বলতে পারেন কি যে, কুরআন ব্যক্তি মালিকানা-প্রথা বিলোপ করে তদস্থলে বিকল্প কি নীতিমালা স্থাপন করেছে? আর অন্য কোন ব্যবস্থার প্রবর্তনই যদি কুরআনের উদ্দেশ্য হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কেন ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাচীন প্রথা চালু রাখলেন এবং নিজেরা অন্যদেরকে ভূমি দান করলেন?

যে আয়াতকে সম্মানিত লেখক দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তার শব্দাবলী এবং প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোন আইন তৈরী করা এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর মহান কুদরত বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য। আর গোটা আলোচনাই এই ভংগীতে পেশ করা হয়েছে :

"রহমানই কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের কথা বলার শক্তি দান করেছেন, তাঁর নির্দেশেই চাঁদ ও সূরুয আবর্তিত হয়। গাছ-গাছালী, ফল-ফলারী সবই তাঁর সামনে সিজদারত। তিনিই উপরে আকাশের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন আর সৃষ্টি জগতের কল্যাণের জন্য যমীনকে নীচে বিছিয়ে দিয়েছেন—যেখানে রয়েছে ফলারি ও খেজুরের গাছ। আরও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শস্য ও সুগন্ধি ফুল। এখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কুদরতের কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?"

এ ভাষণে তামাদ্দুনিক আইন-কানুন বর্ণনার সুযোগ শেষ পর্যন্ত কোথায়? আর এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় উদ্ধৃত "সৃষ্টি জগতের কল্যাণের জন্য নীচে জমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন"-বাক্যাংশটির অর্থ কিভাবে এই হয় যে, 'ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা অবৈধ?" কুরআন হতে বিধি-বিধান বের করার জন্য প্রয়োজন হলো আয়াতের শব্দসমূহ ও তার স্থান-কাল এবং পূর্বাপর প্রেক্ষাপট দৃষ্টির সামনে রাখা। এ কথার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমরা এ আয়াত থেকে যে আইন প্রণয়ন করছি—তাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের জীবদ্দশায় কার্যকর করেছিলেন কিনা? যদি জানা যায় যে, তিনি এরূপ বিধান জারি করেননি বরং তার বিপরীত কাজই করেছেন তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে স্থূল দৃষ্টিতে কুরআনের যে মর্ম আমরা উপলব্ধি করছি তা ভুল। কারণ কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে কার্যকর করে দেখাবার ও জীবনের সকল স্তরে তা জারি করার জন্যই নবী (সা)-কে পাঠানো হয়েছে। কুরআনের বিধান অনুযায়ী যদি তিনি জীবনযাপনের পুরানো নিয়ম-কানুন সংশোধন না করতেন এবং আল্লাহর আইন জারি করার স্থলে পুরানো আইনের অনুসরণ করতেন, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে প্রেরণ করাই উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়তো। বরং তাঁকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যেতো।

এ কথা তো কমপক্ষে সবাই স্বীকার করবেন যে, রাসূলে করীম (সা) -এর কোন কাজই কুরআনের পরিপন্থী ছিল না এবং হতেও পারে না।

২

গ্রন্থকারের জবাব

"কুরআন থেকে ভূমির ব্যক্তি-মালিকানা প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ের উপর আপনার আপত্তি থাকলে প্রমাণ হিসেবে কোন আয়াত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। কোন যুগের ইতিহাস দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। কেননা, ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিবেশ আছে। হয়ত সে পরিবেশ আজ নাও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কুরআনে করীম সম্পর্কে আমার ও আপনার দৃষ্টিকোণের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা কুরআনকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মনে করি যা মানুষের

পার্থিব ও ধর্মীয় সার্বিক সমস্যার সমাধান। এ প্রাকৃতিক জগত যেমন মানুষের জীবন ধারণের জন্য সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ, তেমনি এই প্রাকৃতিক বাণী অর্থাৎ কুরআনকেও আমরা মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক সব সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানের গ্রন্থ মনে করি। মানব জাতি আজ সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য অস্থির এবং এর মধ্যে ভূমি দখলের সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, এর কারণেই মানব সমাজে সম্পদের নেহায়েত অসম বন্টন হয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে, কুরআনে এর কোন সমাধান নেই? আপনার ধারণা যে, কুরআন وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ বলে শুধু আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে আল্লাহর মহান কুদরতের শুকরিয়া হলো এই যে, আমরা তদনুযায়ী আমল করবো। এ সূরাতেই আছে وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ আয়াত যার অর্থ হলো, 'সমুদ্রে বিচরণশীল পাহাড়ের মত উচু উচু জাহাজসমূহ তাঁরই।' এর অর্থ এই যে, সমুদ্রে বৃটিশ ও জাপানী জাহাজগুলো দেখে আপনি আল্লাহর কুদরতের প্রশংসা করবেন, না নিজে বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবেন? সর্বাবস্থায় আল্লাহর কালাম একটি প্রাকৃতিক জিনিস। এর উপকারিতা সীমিত ও সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। তাই কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে আপনার এ কথা বলা ঠিক নয় যে, শুধু অমুক উদ্দেশ্যে তা বলা হয়েছে। এ থেকে যদি অন্য কোন উপকার লাভ করা যায় তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে। প্রাকৃতিক জিনিসের এটাই হলো ধর্ম। বাবা আদম (আ) পানি সম্পর্কে অবশ্যই জানতেন যে, পানি গোসল ও পান করার জিনিস। কিন্তু আদম সন্তানগণ এই পানির সাহায্যেই বড় বড় মেশিন রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদি চালাতে শুরু করে। আর এ পর্যন্ত তার উপকারিতা সীমাবদ্ধ নয়। এ হতেই ভারী পানি (Heavy Water) আবিষ্কার করা হয়েছে যা হলো দুনিয়ার সর্বাধিক দামী বিষ। আর এ হতেই পেট্রোলিয়ামের ফর্মূলাও উদ্ভাবিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহের অবস্থাতো হুবহু তাই। তার জ্ঞানকে কোন বিশেষ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। কুরআন প্রতিটি যুগেই একটা নতুন জগত সৃষ্টি করতে পারে।

৩

তর্জুমানুল কুরআনের পক্ষ থেকে লেখকের জবাবের জবাব

বিষয়টির মধ্যে আপনি অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে এনেছেন এবং আমার সমালোচনার কোন জবাব দেননি। وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আয়াতটি থেকে স্পষ্ট এ বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন যে, এ আয়াতের আলোকে ভূমির ব্যক্তি মালিকানা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে আমার দুই দিক থেকে আপত্তি ছিল।

এক : ভূমির ব্যক্তি মালিকানা অধিকার বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মত এরূপ বিপ্লবাত্মক মৌলিক পরিবর্তন যদি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ধরনের ইশারা ইঙ্গিতে তা বর্ণনা করত না যার থেকে আপনি এ অর্থ গ্রহণ করেছেন, বরং সে স্পষ্টভাবে প্রাচীন প্রথাকে নিষিদ্ধ করার আদেশ দিত এবং ভূমির ভবিষ্যত ব্যবহার পদ্ধতি কি হবে তাও সুস্পষ্ট করে বলে দিত।

দুই : কুরআন পাকের উদ্দেশ্য যদি তাই হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি কেন? রাসূলুল্লাহ (সা)–কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যইতো এই ছিল যে, তিনি আকীদা, আখলাক, সমাজ, তামাদ্দুন, অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি তথা মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগকে কুরআনের বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে ইসলামী আদর্শের বাস্তব নমুনা দেখিয়ে দেবেন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সা)–কে পরিবেশের দাসত্ব করার জন্য পাঠানো হয়নি বরং আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলা তাঁর কাজ ছিল না, বরং দুনিয়ার গতি পরিবর্তন করে কুরআনের নির্দেশিত গতি অনুযায়ী চালানোই ছিল তাঁর কাজ। এখন আপনার বক্তব্য অনুযায়ী একদিকে যদি মেনে নেয়া হয় যে, কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন এবং অপরদিকে যদি এ অনস্বীকার্য বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিমালিকানার প্রাচীন ব্যবস্থা বিলোপ করেননি বরং তা বহাল রেখেছেন। তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে দু'টি কথার

একটি মেনে নিতে হয়, অথবা এ কথা বলতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, অথবা তিনি এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন ঠিকই কিন্তু কুরআনের এই বিধান কার্যকর করেননি এবং কুরআনের বর্ণিত ব্যবস্থা উপেক্ষা করে তিনি দুনিয়ায় প্রচলিত আল্লাহর মর্জি বিরোধী ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন বলুন। এ দু'টি দিকের কোন্‌টি আপনি গ্রহণ করছেন?

এই ছিল আমার আপত্তি। কিন্তু আপনি এদিকে একেবারে দৃষ্টিই দেননি এবং কুরআন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছেন। এর উপরও ধৈর্যধারণ করা যেতো যদি আপনার ব্যাখ্যায় সমস্যার কিছুটা সমাধান হত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনার বিশ্লেষণ বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছে।

আপনি বলেছেন "আমি কুরআনকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মনে করি" এটা বড়ই আনন্দের কথা। কিন্তু এ রকম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করার কারণে আল্লাহর প্রতি এরূপ বেইনসাফী করাতো ঠিক নয় যে, তার আয়াতসমূহ এবং আয়াতাংশকে তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা থেকে এমন অর্থ বের করা শুরু করে দেবেন যা শুধু সংশ্লিষ্ট আলোচনার ধারাবাহিকতার সাথেই নয়—বরং গোটা কুরআনের শিক্ষার সাথেই সামঞ্জস্যহীন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এ পন্থা পৃথিবীর কোন বক্তৃতা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ বা বাক্যের ব্যাপারেই সঠিক নয়, আর কোথায় আল্লাহর কিতাবঃ তাকে যজ্ঞের বলি বানানোর চেষ্টা। নিজের পসন্দমত কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করার জন্য আপনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমি যদি ঠিক তেমনি আপনার কোন প্রবন্ধের অংশ বিশেষের অর্থ করি তাহলে আপনি চীৎকার করে বলে উঠবেন—"এটা আমার লেখার প্রতি স্পষ্ট যুলুম!" নিশ্চিতই আল্লাহর বাণী প্রাকৃতিক বাণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করেছেন তা নিসন্দেহে প্রকৃতির পরিপন্থী।

আপনি বলেছেন, মানব সমাজের সমস্যাগুলোর মধ্যে ভূমি ভোগ দখলের সমস্যাটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা, এ কারণেই মানব সমাজে

অত্যন্ত অসমভাবে সম্পদ বন্টিত হয়েছে। তাই কুরআন এ সমস্যার সমাধান করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। খুবই যথার্থ কথা। মানব জীবনের সমস্যাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এর সমাধানের জন্য কুরআনের দিকে ঝুঁকতে হবে এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু সে জন্য যুক্তিসঙ্গত পন্থা এই যে ঃ সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি কি? কুরআন সম্পদের সমবন্টন চায়, না সুসম বন্টন চায়? সে অসম বন্টন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন চায়, না ইনসাফহীন বন্টন ব্যবস্থার বিলোপ চায়? এসব প্রশ্নের উত্তর আপনাকে কুরআন থেকেই জানতে হবে। এর পর কুরআন তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভূমির ব্যক্তি মালিকানার প্রাচীন প্রথার আমূল পরিবর্তন চায়, না তা বহাল রেখে কিছু সংশোধনী পেশ করতে চায়? আপনার তরফ থেকে এসব বিষয়ে কোন জবাব দেবার আগে আপনি নিজে অনুসন্ধান করুন—এ ব্যাপারে কুরআনের নিজের জবাব কি? তার জবাবে আপনি যদি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন তাহলে তা গ্রহণ করুন, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করুন। আর দ্বিতীয় যে সমাধানটি আপনি সঠিক বলে মনে করছেন তা প্রচার করতে থাকুন এবং পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে, "আমার দৃষ্টিতে কুরআনে বর্ণিত সমাধানটি ত্রুটিপূর্ণ। তার পরিবর্তে বরং এ সমাধানটি সঠিক।" এই যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি বাদ দিয়ে আপনি সম্পদ বন্টনের আদর্শ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন মার্কস ও লেলিন থেকে। আর জোর করে তা কুরআনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে আপনি সবাইকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন যে, এটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নয় বরং কুরআনের আদর্শ। এত বড় অন্যায়ের পর আপনাকে কেউ তা দেখিয়ে দিলে আপনি তাকে লেকচার দিয়ে বুঝাবার প্রয়াস পাচ্ছেন যে, বাবা আদমের সময়ে পানির ব্যবহার এক রকমভাবে হতো আর বর্তমান কালে হয় আর একভাবে। তাই কুরআন ব্যবহারের পদ্ধতি এখন পরিবর্তন হয়ে অন্য কিছু হয়ে গেছে।

আপনি বলেছেন ঃ "সূরা আর রাহমানে وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ আয়াতাংশে তো আল্লাহ নিসন্দেহে নিজের কুদরত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এই কুদরতে ইলাহীর শুকরিয়া হলো তদনুযায়ী আমাদের কাজ করা।" "অর্থাৎ সমগ্র ভূমিকে আনামের (সৃষ্টিজগতের) সামগ্রিক

মালিকানায় ছেড়ে দেয়া।[১] বিনীতভাবে আরয করছি যে, কুরআনের আয়াতে হস্তক্ষেপের এ কসরত যদি সম্পদের অসম বন্টনের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যেই করে থাকেন তাহলে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সূরা আর রাহমানের এ আয়াতের পরিবর্তে সূরা বাকারার خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا (পৃথিবীর সব কিছুই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন) আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি আপনি নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তও বের করা যেতো যে, শুধু ভূমিই নয় বরং টাকা পয়সা (আপনি ভুলবশত যার মধ্যে মিরাসী আইনকেও ধরে নিয়েছেন) খাদ্য, বস্ত্র, থালা-বাসন, গবাদি পশু (যেগুলোকে আপনি ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে গণ্য করার মত ভুলেরও অবতারণা করেছেন) ঘর-বাড়ী, যান-বাহন মোট কথা সব কিছুই ব্যক্তি মালিকানা থেকে বের করে সামষ্টিক ও জাতীয় মালিকানাধীন করে দেয়া হোক। এ ব্যবস্থায় এক নিমিষেই সম্পদের অসম বন্টনের ত্রুটিও বিদূরীত হয়ে যেতো, সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনটাও অপূর্ণ না থেকে পূর্ণ হয়ে যেতো।

কুরআনের উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য রাসূল (সা)-এর আমলকে ফায়সালা হিসেবে মানা যাবে না-আপনার এ দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আপত্তিকর। আমি নিবেদন

---

১. সমালোচনাধীন গ্রন্থখানার লেখকের ইজতিহাদ তো কয়েক বছরের পুরাতন হয়ে গেছে। আজকের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট ইসলামের মুজাহিদরা কুরআন থেকে আরও একটি আয়াতাংশ اَلْاَرْضُ لِلّٰهِ খুঁজে বের করেছেন এবং এর উপর রিসার্চের মনগড়া একটা গোটা "ক্রেমলিন" নির্মাণ করে বসেছেন। অথচ যে গোটা আয়াত থেকে এ অংশটুকু বেছে নেয়া হয়েছে তা তাদের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বহন করে। পূর্ণ আয়াতটি হলো-

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ (اعراف ١٢٨)

"যমীন আল্লাহর। আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পসন্দ করেন তাদেরই এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।" (সূরা আ'রাফ : ১২৮)। তার পর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কুরআনে শুধু وَالْاَرْضُ لِلّٰهِ কথাটুকুই আছে তবুও এর অর্থ করার কোন অবকাশ ছিল না যে, ভূমি ব্যক্তি মালিকানায় যেতে পারে না, বরং জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যেতে পারে। কেউ এরূপ মনগড়া অর্থ করতে চাইলে তো বলতে হয় যে, দুনিয়ার কোন জিনিসই ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ পাক পরিষ্কার বলেছেন لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর।"

করেছিলাম যে, কোন আয়াত থেকে আমাদেরকে কোন বিধান বের করতে হলে, রাসূল (সা)–এর সময় এর উপর আমল করা হয়েছিল কিনা এবং তখন তা কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথার উত্তরে আপনি বলেছেন, "কোন কালের ইতিহাস থেকে এ সমস্যার সমাধান হয় না।" এ ধরনের জবাব দেবার সময় বোধ হয় আপনি চিন্তা করে দেখেননি যে, এর যৌক্তিক পরিণতি কি দাঁড়াবে? কারণ, যদি একদিকে মেনে নেই যে, ভূমিকে ব্যক্তি মালিকানা থেকে বের করে সামষ্টিক মালিকানার নিগড়ে আটকিয়ে দেয়াই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য তাহলে অপরদিকে দেখি এ কাজ না রাসূলে করীম (সা) তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার সময় করেছেন আর না করেছেন খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের শাসনামলে। সাহাবা, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং বিগত তের শত বছরের সর্ব জনমান্য ফিক্‌হবিদগণের কেউ এমন কথা কল্পনাও করেননি। তাই নিম্নোক্ত কথার কোন একটি কথা অবশ্যই আমাদেরকে মানতে হবে। হয় মানতে হবে যে, এই কুরআনকে কুরআনের বাণীবাহক রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুরু করে গোটা উম্মতে মুসলিমার আলেম, ফিক্‌হবিদ এবং সম্মানিত ইমামদের কেউ বুঝেননি। এগুলো বুঝার সৌভাগ্য হয়েছে কেবল মাত্র মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের। অথবা মানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবাগণ তো কুরআনের উদ্দেশ্য বুঝেছেন কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে তাঁদের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কমরেডদের। কুরআনের উদ্দেশ্য বুঝার সমস্যাটা রাসূলের (সা) কালের ইতিহাস থেকে যদি সমাধান না হয় তাহলে কি তা নিজে নিজেই সমাধান হয়ে যাবে? আপনি কি বাস্তবিকই এতে সন্তুষ্ট?

৪

জনৈক নিবন্ধকার কর্তৃক লেখককে সমর্থন

এতে তো সন্দেহ নেই যে, যে আয়াত থেকে গ্রন্থকার এই বিষয়টি গবেষণা করে বের করেছেন সেই আয়াতটি বাহ্যত মৌলিক বিধানের ধারক মনে হয় না, কিন্তু পক্ষান্তরে আপনিও তো ভূমির ব্যক্তি মালিকানার সমর্থনে

কুরআনের কোন আয়াত উদ্ধৃত করেননি। এখন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর উসওয়ায়ে হাসানাই হবে সিদ্ধান্তকর কথা। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যা কিছু বুঝেছি, তাতে দেখছি রাসূলে পাক (সা)–এর পবিত্র হাদীসও লেখকেরই বক্তব্যের পোষকতা করছে। সহীহ বুখারী কিতাবুল মুযারায়া 'বাবু কিরাউল আরদে'র একটি বর্ণনায় আছে ঃ

(١) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ صـ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ

"হযরত রাফে বিন খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) ভূমির কেরায়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"

(٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ – فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا –

"হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ আমরা এক–তৃতীয়াংশ, এক–চতুর্থাংশ এবং আধাভাগে জমীন বর্গা দিতাম। মহানবী (সা) বললেন ঃ যার যমীন আছে, হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা অন্যকে তা দিয়ে দেবে।"

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا اَوْ يَمْنَحْهَا اَخَاهُ –

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যার জমি আছে, হয় সে নিজে তা আবাদ করবে অথবা তার কোন ভাইকে তা দিয়ে দেবে।"

এ ছাড়াও রাফে' বিন খাদীজ (রা) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে তিনি বলেছেন যে, তার চাচা ভূমির উৎপাদনের চার ভাগের একভাগ এবং কয়েক ওসক খেজুর ও বার্লির বিনিময়ে লাগাতেন। রাসূলে করীম (সা) তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ নিজে চাষাবাদ করো অথবা অন্যকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়ে দাও।

এর সাথেই বুখারীতে ইবনে উমার (রা)–এর এ ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলে পাক (সা)–এর সময় থেকে শুরু করে হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফতের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত জমি কেরায়ায় চাষাবাদ করতে দিতেন। এ সময় তিনি রাফে' বিন খাদীজ (রা)'র বর্ণিত এ হাদীসের খবর পেলেন। রাফে' বিন খাদীজ (রা)কে তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'সত্যি সত্যিই মহানবী (সা) জমি কেরায়ার ভিত্তিতে দিতে নিষেধ করেছেন। তাই এর পর থেকে ইবনে উমার (রা) কেরায়ায় জমি চাষাবাদ করতে দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

হতে পারে এসব হাদীসের সঠিক অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। আর যদি এগুলোর অর্থ তাই হয় যা দৃশ্যত বুঝা যায় তাহলে এ ব্যাখ্যার আলোকে প্রবন্ধ লেখক ভূমির ব্যক্তি–মালিকানা বিলুপ্তির সিদ্ধান্তে পৌছলে আমার মনে হয় তাকে শুধু সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে প্রভাবিত বলা ঠিক হবে না। সমাজতন্ত্রকে প্রমাণের জন্য তিনি বুখারী শরীফের ওই হাদীসকে আরো শক্তিশালী দলীল হিসেবে পেশ করতে পারেন যেখানে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেনঃ نَحْنُ لَا نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ অর্থাৎ "আমরা কোন উত্তরাধীকার রেখে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হলো সদকা।" এর দ্বারা তো বুঝা গেলো সকল রাসূল (সা) এ হিসেবে প্রকৃতিগতভাবে কমিউনিষ্ট ছিলেন।[১] (নাউযু বিল্লাহ)

---

১. সম্মানিত সমালোচক এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তাই আমি এ ব্যাপারে মূল বিষয়বস্তুর সাথে এখানে অন্য আলোচনা করবো না। কিন্তু অযথা মানুষের মনে একটা সন্দেহ থেকে যাবে এ আশংকায় আমি টীকার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

ঘটনা হলো, রাসূল (সা) তাঁর নিজের সম্পদ এবং হযরত বিবি খাদীজা (রা)'র সম্পদ হতে নবুয়তের প্রথম দশ–এগার বছর পর্যন্ত খরচ করেছেন। কিন্তু পরে নবুয়তের দায়িত্ব পালন, তাবলীগে দীনের ব্যস্ততার কারণে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করার সুযোগ তিনি পেতেন না। এরপর মক্কী জীবনের শেষ ও মদীনার জীবনের প্রথম দিকে আল্লাহর ফজলে প্রাপ্ত বিজয় লব্ধ গনীমতের সম্পদের অংশ দিয়ে তিনি তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিজয় পালা শুরু হলে আল্লাহ তাআলা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে বনী নজীরের 'ফায়' (যুদ্ধলব্ধ পরিত্যক্ত সম্পদ)–এ তাঁর জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। অপরদিকে 'খায়বার' ও ফাদাকের বন্টিত মালে গনীমত থেকে তিনিও যুদ্ধে যোগদানকারী অন্যান্য অংশীদারদের সাথে অংশ লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম অংশের ব্যাপারে মহানবী (সা) হেদায়াত দিয়েছিলেন তা হলো–

৫

তর্জুমানুল কুরআনের শেষ জবাব

আপনি নিজে স্বীকার করেন যে, প্রবন্ধকার যে আয়াতের মাধ্যমে ভূমির মালিকানার অবৈধতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা কোন আইন প্রণয়ন করার মত আয়াত নয়। কিন্তু এরপর আপনি আমার নিকট ভূমির মালিকানার বৈধতার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত পেশের দাবী করেছেন। আপনার এ দাবী পূরণের আগে আমি আপনাকে একটি মূলনীতি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন কোন প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করা হয় তখন তাকে সব সময়ই সম্মতি ও বৈধতার সমর্থক বলে ধরে নেয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কোন এলাকায় লোকেরা জনসাধারণের চলাচলের জন্য কোন যমীনের উপর দিয়ে পথ বানিয়ে রাখে এবং সেখান দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ বলে কোন নোটিশ লাগানো না হয় তাহলে এর অর্থ হবে ঐ পথে যাতায়াতের অনুমতি আছে। এই বৈধতার জন্য নতুনভাবে কোন ইতিবাচক অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

اِنْ اللّٰهَ اِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طَعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِيْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهٖ (ابو داود)

অর্থাৎ–"কোন নবীর জীবিকা নির্বাহের জন্য আল্লাহ পাক যে উপায়–উপকরণ তাঁকে দান করেন তাঁর (মৃত্যুর) পর তা ওই ব্যক্তির যিনি এ দায়িত্ব পালনের স্থলাভিষিক্ত হবেন।"

আর দ্বিতীয়াংশের ব্যাপারে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন

نَحْنُ لَانُوْرِثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ

আমরা (ধন–সম্পদ লাভের জন্য) উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তাহলো সদকা। মহানবী (সা) এটাকে কেন সদকা বললেন এবং সকল নবীদের কেন একই পদ্ধতি হলো যে, নবীদের রুজী–রোজগার নিজের জীবন ধারণের জন্য, ব্যক্তি সম্পদ বানিয়ে উত্তরাধিকারদের জন্য রেখে যাবার তরে নয়–একটু লক্ষ্য করলেই তা সহজে বুঝা যাবে। যে গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহতাআলা নবীদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন তার দাবী ছিল নিজেদেরকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে রাখা। তাই প্রত্যেক নবীর মুখ থেকেই আল্লাহ পাক এ ঘোষণা জারী করেছেন ঃ

لَاَاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

"এ কাজের কোন বিনিময় আমি তোমাদের কাছে চাই না। আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে।"

অতএব মহানবী (সা)–এর এ সদকা বলার কারণ ছিল, তাঁর রিসালাতের যুগের কামাই–রুজীকে তিনি রিসালাতের পারিতোষিক বানোনো পসন্দ করেননি। এর সাথে কমিউনিজমের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

কারণ সে পথে যাতায়াত নিষিদ্ধ না হওয়াটাই স্বয়ং অনুমতির অর্থ সৃষ্টি করছে। ভূমির মালিকানার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। ইসলামের পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে দুনিয়ায় এ প্রথা জারি ছিল। কুরআন তা নিষিদ্ধ করেনি, তা মওকুফ করার জন্য কোন স্পষ্ট নির্দেশও দেয়নি, এর পরিবর্তে অন্য কোন আইনও প্রণয়ন করেনি এবং এমনকি ইশারা ইঙ্গিতে কোথাও এর সমালোচনাও করেনি। এর অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা এই পুরাতন রেওয়াজকে বৈধ রেখেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করেই মুসলমানগণ কুরআন নাযিল হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভূমিকে সেভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় রাখছে যেভাবে ইতিপূর্বে তা ব্যক্তি মালিকানায় আনা হত। এখন যদি কেউ এটা নাজায়েয হওয়ার দাবী করে তবে তাকে নাজায়েয হওয়ার দলীল পেশ করতে হবে—আমার কাছে সে এর প্রমাণ চাইতে পারে না।

কিন্তু কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, কুরআন প্রাচীন প্রথাকে মওকুফ করেনি, বরং আপনি যদি কুরআনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন তবে জানতে পারবেন যে, কুরআন এ প্রথাকে ইতিবাচকভাবেই বৈধ হিসেবে সমর্থন করেছে এবং এরই ভিত্তিতে আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে হুকুম দিয়েছে। দেখুন। ভূমির সাথে মানুষের দুটি উদ্দেশ্য জড়িত, হয় 'চাষাবাদ' অথবা 'বসবাস'। এ দুটি উদ্দেশ্যে কুরআন জমির ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে।

সূরা আনআমে বলা হয়েছে– كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ – "এর ফলমূল থেকে খাও যখন তা ফলে এবং এর ফসল কাটার সময় তাঁর (আল্লাহর) হক আদায় কর।"

এখানে আল্লাহর হক আদায় করার অর্থ দান–খয়রাত ও যাকাত প্রদান। প্রকাশ থাকে যে, ভূমির উপর সামাজিক মালিকানা হলে যাকাত দেয়া বা নেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ হুকুম তো কেবল তখনই দেয়া যেতে পারে যখন কিছু লোক ভূমির মালিক হবে এবং সে এর উৎপাদন থেকে আল্লাহর হক পৃথক করে ভূমিহীন নিঃস্বদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে যা আল্লাহর জন্য বের করে রেখেছিল। এখন বলুন—যাকাতের নির্দেশ জারি করে কুরআন ভূমির ব্যক্তি মালিকানার প্রাচীন প্রথার প্রত্যয়ন করেছে কিনা? অন্য আর এক আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ - (البقرة ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ করো এবং সেইসব জিনিস থেকে যা আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেছি।" (বাকারা ঃ ২৬৭)

জমির উৎপাদন থেকে খরচ করার যে হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সকলেই একমত যে, তাহলো যাকাত ও দান-খয়রাত। যারা উৎপাদিত জিনিসের মালিক হবে তাকেই এ হুকুম পালন করতে হবে। আর এ দান তাদের জন্য করতে হবে যারা সহায়-সম্পত্তির মালিক নয়। বস্তুত দান-খয়রাত কার প্রাপ্য কুরআনে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ (البقرة - ٢٧٣)

"এটা অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, তারা দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না।"-(বাকারা ঃ ২৭৩)

وَاِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ (التوبة : ٦٠)

"যাকাত তো কেবল নিস্ব, অভাবগ্রস্ত ..... প্রাপ্য।" -(তওবা ঃ ৬০)।

এখন দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূরা নূরে বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ....فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ - (النور : ٢٧ - ٢٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে বিনানুমতিতে প্রবেশ করো না। আর প্রবেশ করেই বাড়ীর মালিককে সালাম করবে .... যদি সেখানে কাউকে না পাও তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করো না।" (নূর ঃ ২৭-২৮)।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, কুরআন মজীদ বসবাসের জন্যও ভূমির ব্যক্তিগত দখল ও মালিকানার স্বীকৃতি দান করে এবং মালিকের এই অধিকার স্বীকার করে যে, তার অনুমতি ছাড়া কেউ তার দখলীভুক্ত এলাকায় পা রাখতে পারবে না।

এখন হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আমি দেখে খুশী হলাম যে, আপনি কুরআনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে রাসূলে পাক (সা)–এর উসওয়ায়ে হাসানাকে সিদ্ধান্তকারী বাণী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি এ জন্য যে, যেসব হাদীস আপনি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোকে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যার সমর্থক সাব্যস্ত করেছেন। অথচ সেগুলো ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রমাণ করছে এবং এর একটিরও লক্ষ্য এই নয় যে, ভূমিকে ব্যক্তির দখল থেকে বের করে তাকে জাতীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হবে। অবশ্য এ হাদীসগুলোর ভিত্তিতে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, রাসূল (সা) কিরায়া (নগদ বিক্রি) ও মুজারেয়াত (ভাগ চাষ) নিষেধ করেছেন এবং মহানবী (সা)–এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এতটুকু পরিমাণ ভূমি থাকবে যা সে নিজে চাষাবাদ করতে সক্ষম। এই ভুল ধারণাও কেবল এ জন্য সৃষ্টি হয় যে, লোকেরা কোন জায়গা হতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হাদীস নিয়ে এসে তার থেকে একটি অর্থ গ্রহণ করে বসে। অন্যথায় যদি সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর হাদীস এবং তাঁর যুগের কার্যক্রম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগের কার্যক্রম দেখা যায় এবং নবী করীম (সা)–এর নিকটবর্তীকালের ইমামগণ কুরআন, হাদীস ও সাহাবাদের বাণীর উপরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ভূমির মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের কি আইন বুঝেছিলেন তাহলে এ সম্পর্কে মোটেই সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে, ইসলাম শুধু ব্যক্তি মালিকানাই জায়েয রাখে না, বরং ইসলাম এ মালিকানার কোন নির্দিষ্ট সীমাও নির্ধারণ করে না এবং জমির মালিককে এই অধিকার দেয় যে, যে ভূমি সে নিজে চাষাবাদ করতে পারবে না তা অপরকে মুজারায়ায় (ভাগ চাষে) অথবা কিরায়ায় (নগদ অর্থের বিনিময়ে) চাষাবাদ করতে দিতে পারবে। এখন আসুন এ বিষয়ে আমরা ইসলামী আইনের মূল উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখি।

ভূমির ব্যক্তি মালিকানা হাদীসের আলোকে

রাসূলে করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোন্ পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তা বুঝার জন্য মনে রাখতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আসা ভূমি চারটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হত ঃ

(১) যে ভূমির মালিক ইসলাম কবুল করেছিল।

(২) যে ভূমির মালিক নিজেদের ধর্মেই বহাল থেকে যায় কিন্তু একটি চুক্তির মাধ্যমে নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন করে দেয়।

(৩) যে ভূমির মালিক যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

(৪) যে ভূমি কারো মালিকানায় ছিল না।

এসব ব্যাপারে রাসূল (সা) ও তাঁর খলিফাগণ কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা আমরা পৃথক পৃথক বর্ণনা করবো।

প্রথম প্রকারের হুকুম

প্রথম প্রকারের মালিকানার ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা) যে নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তা হলো ঃ

اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ –

"মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ করে নেয়।"

اَنَّهُ مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ (كتاب الاموال لابى عبيد)

"ইসলাম গ্রহণ করার সময় মানুষ যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই মালিকানায় থাকবে।"

এ নীতিমালা স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত এবং এ ব্যাপারে অকৃষিজ ও কৃষিজ উভয় জমির বেলায় একইরূপ নীতি অনুসরণ করা হত। হাদীস ও আছারের গোটা সংগ্রহ এ কথার সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের কোথাও ইসলাম গ্রহণকারীদের মালিকানার ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেননি। যে ব্যক্তি যে ভূমির মালিক ছিল তাকে সেটারই মালিক থাকতে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন ঃ

"যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের রক্ত (হত্যা করা) হারাম। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁরা যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই থাকবে। এভাবে তাদের ভূমি তাদের মালিকানায়ই থাকবে। আর এ ভূমিকে 'উশরী' ভূমি বলে অভিহিত করা হবে। এর নজীর হলো মদীনা। মদীনাবাসী রাসূলে করীম (সা)–এর হাতে ইসলাম কবুল করেন এবং তারা তাদের ভূমিরও মালিক থাকেন। এ ভূমির উপর 'উশর' ধার্য করা হয়েছিল। তায়েফ ও বাহরাইনের লোকদের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব বেদুঈন ইসলাম কবুল করেছে তাদেরেও নিজ নিজ কূপ ও এলাকার মালিক হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। তাদের জমি 'উশরী'। তা থেকে তাদেরকে বেদখল করা যাবে না। এ জমিকে তারা বিক্রি করতে এবং তাদের উত্তরাধিকারগণ সব অধিকার এতে ভোগ করতে পারবে। অবিকলভাবে যে এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম কবুল করবে সে তার সম্পদের মালিক থাকবে।" (কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৩৫)

ইসলামের অর্থনীতি বিষয়ক আইনের আরেক বিশেষজ্ঞ ইমাম আবু ওবায়দ আল কাসেম ইবনে সাল্লাম লিখেন ঃ

"হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর খলীফাদের নিকট হতে যে 'আছার' আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা ভূমির ব্যাপারে তিন ধরনের বিধান বহন করে এনেছে। এক প্রকার বিধান হলো, ওই সব ভূমির যার

মালিকগণ ইসলাম কবুল করে। ইসলাম গ্রহণের সময় তারা যে ভূমির মালিক ছিল তা তাদেরই মালিকানায় থাকবে। এসব ভূমিকে 'উশরী' ভূমি বলে অভিহিত করা হবে। 'উশর' ছাড়া এসব ভূমির উপর আর কোনরূপ কর আরোপিত হবে না।" (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৫)।

সামনে এগিয়ে তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"যে এলাকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের জমির মালিক থাকবে, যেমন মদীনা, তায়েফ ইয়েমেন ও বাহরাইন। এভাবে মক্কাও, যদিও অস্ত্রবলে তা জয় করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) মক্কাবাসীদের প্রতি দয়া করেছেন এবং তাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করেননি এবং তাদের সম্পদকেও গনীমতের মাল হিসেবে ঘোষণা দেননি। অতএব এদের ধন-সম্পদ যখন তাদের মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হলো তখন তারা পরে মুসলমান হয়ে গেলো। তাদের মালিকানার হুকুমও তাই থাকলো যা অন্যান্য ইসলাম গ্রহণকারীদের মালিকানার হুকুম ছিল। আর তাদের জমি 'উশরী' জমি হিসেবেই পরিগণিত হলো।"

(ঐ, পৃষ্ঠা ৫১২)

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) যাদুল মাআদে লিখেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নীতি এই ছিল যে, ইসলাম গ্রহণকালে যে ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই মালিকানায় থাকবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তা কিভাবে তার দখলে এসেছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি, বরং তা তার হাতে এভাবেই থাকতে দেয়া হয়েছে যেভাবে প্রথম থেকেই চলে আসছিল।" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬)।

এটা এমন এক মৌলনীতি যাতে ব্যতিক্রমের একটি উদাহরণও রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার কালের নজীরসমূহে পাওয়া যায় না। ইসলাম তার অনুসারীদের অর্থনৈতিক জীবনে যেসব সংশোধনই জারি করেছে তা করেছে ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু আগে থেকেই যে মালিকানা লোকদের দখলে ছিল তার বিরোধ করা হয়নি।

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম

দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে বসবাস করাকে তারা মেনে নিয়েছে। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) যে নীতি নির্ধারণ করেন তা এই যে, যেসব শর্তের ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি হয়েছে তা কোনরূপ রদবদল ছাড়াই পূর্ণ করতে হবে। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُوْنَ بِاَمْوَالِهِمْ دُوْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَبْنَآئِهِمْ فَتُصَالِحُوْنَهُمْ عَلٰى صُلْحٍ فَلاَ تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَالِكَ فَاِنَّهُ لاَيَصْلُحُ (ابوا داؤد و ابن ماجه)

"যদি কোন জাতির সাথে তোমাদের যুদ্ধ বাধে এবং তারা ধন-সম্পদের বিনিময়ে তোমাদের নিকট তাদের নিজের ও সন্তানদের জীবন রক্ষা করতে তৈরী হয়ে যায় এবং তোমরা তাদের সাথে সন্ধি করো তাহলে সন্ধি চুক্তির চেয়ে বেশী কিছু তোমরা তাদের নিকট থেকে আদায় করো না। কারণ তা তোমাদের জন্য জায়েয হবে না।"

اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ انْتَقَصَهُ وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (ابو داود)

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ যিম্মির উপর যুলুম করবে অথবা চুক্তি অনুসারে তার যে অধিকার আছে তা ক্ষুণ্ন করবে, অথবা তার উপর তার সামর্থের বেশী বোঝা আরোপ করবে অথবা সম্মতি ছাড়া তার থেকে কোন বস্তু আদায় করবে—কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাবো।" (আবু দাউদ)।

এ নীতিমালা অনুযায়ী নাজরান, আয়লা, আযরুআত, হিজরসহ অন্যান্য যে সব এলাকা ও গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ধি করেছেন তাদের জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উপর

তাদের মালিকানা পূর্ববৎ বহাল রাখেন এবং তাদের নিকট থেকে চুক্তি মোতাবিক শুধু জিযিয়া ও খাজনা আদায় করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদাও এ নীতির উপরই আমল করেছেন। ইরাক, সিরিয়া, আলজাযিরা, মিসর, আরমেনিয়া মোট কথা যেখানে যেখানে কোন শহর বা জনপদের লোকেরা সন্ধির ভিত্তিতে নিজদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন করে দিয়েছে তাদের ধন–সম্পদ যথারীতি তাদের দখলেই থাকতে দেয়া হয়েছে এবং যে মালের বিনিময়ে সন্ধি হয়েছে তা ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করা হয়নি। হযরত উমার (রা)–এর সময়ে কোন কোন বিশেষ সার্বিক কল্যাণকর ভিত্তিতে নাজরানের অধিবাসীদেরকে আরবের অভ্যন্তর থেকে সিরিয়া ও ইরাকে বহিষ্কার করা হলেও তাদের যার যার কাছে নাজরানের যে পরিমাণ কৃষিজ ও বসবাসযোগ্য ভূমি ছিল তার বিনিময়ে অন্যত্র শুধু ওই পরিমাণ ভূমিই তাদেরকে দেয়া হয়নি, বরং হযরত উমার (রা) সিরিয়া ও ইরাকের গভর্ণরদেরকে সাধারণ নির্দেশ লিখে পাঠান যে, "তারা যে যে এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করবে সেখানে فَلْيُوسِعْهُمْ مِنْ خَرِيبِ الْأَرْضِ "তাদেরকে প্রশস্ত মনে উর্বর জমি দিয়ে দাও।"

(কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃঃ ১৮৯)

এই মূলনীতির ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সা)–এর সময়ের ও খিলাফতে রাশেদার কালেও কোন ব্যতিক্রম করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইসলামের ফিকাহবিদদের এটাও সর্বসম্মত রায়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাঁর 'কিতাবুল খারাজে' এটাকে একটা আইনের একটি দফা হিসেবে এভাবে বিধৃত করেছেন ঃ

> "অমুসলিমদের যে জাতির সাথে ইমামের এ শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে এবং কর প্রদান করবে তাহলে তারা যিম্মী। তাদের ভূমি খারাজের (কর) অন্তর্ভূক্ত ভূমি। যে শর্তে সন্ধি হয়েছে তাদের নিকট হতে ঠিক তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে অঙ্গীকার পুরা করতে হবে। শর্তের অতিরিক্ত কোন কিছু করা যাবে না।"

(পৃঃ ৩৫)

তৃতীয় প্রকারের হুকুম

আর যেসব লোক শেষ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে এবং অস্ত্রের মুখে পরাজিত হবে তাদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা) ও খিলাফতে রাশেদার সময়ের আমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা দেখতে পাই ঃ

এক—যে কর্মপন্থা নবী করীম (সা) মক্কায় অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (আজ তোমাদের উপর কোনরূপ প্রতিশোধ নেয়া হবে না)–এর মত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে বিজিতদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা দান। এ অবস্থায় মক্কাবাসীরা নিজদের জায়গা–জমি ও ধন–সম্পদের যথারীতি মালিক থাকে। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের এসব জমি 'উশরী ভূমি' হিসেবে পরিগণিত হয়।

দুই—যে কর্মপন্থা খায়বারে অবলম্বন করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিজিত সাবেক মালিকদের মালিকানা বিলুপ্ত করা হয়েছে। এক অংশ নিয়ে নেয়া হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) জন্য। বাকী জমি খায়বারে যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময় যারা ইসলামী সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এ বন্টিত ভূমি যাদের যাদের ভাগে পড়ে তারাই এর মালিক গণ্য হয়। এ ভূমিতে 'উশর' ধার্য হয়।

(কিতাবুল আমওয়াল আবি উবায়দ, পৃঃ ৫১৩)।

তিন— যে কর্মপন্থা সিরিয়া ও ইরাকে প্রাথমিকভাবে হযরত উমার ফারুক (রা) অবলম্বন করেছিলেন। অতপর সকল বিজিত এলাকা ঐ নীতি অনুযায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়। তিনি বিজিত এলাকাসমূহ বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার পরিবর্তে তার উপর সকল মুসলমানের সমষ্টিগত মালিকানা সাব্যস্ত করেন। এর ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে নিজের হাতে নিয়ে নেন। মূল অধিবাসীদেরকে আগের মত তাদের ভূমির মালিক হিসেবে বহাল থাকতে দিলেন। তাদের যিম্মী ঘোষণা করে তাদের উপর জিযিয়া ও খারাজ (কর) ধার্য করলেন এবং এ জিযিয়া ও খারাজ সাধারণ মুসলমানদের জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয়ের ঘোষণা দেন। কেননা, মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারাই ছিল বিজিত এলাকাসমূহের মালিক।

এ শেষ পদ্ধতিতে দৃশ্যত 'সমষ্টিগত মালিকানার' ধারণার একটা ইংগিত পাওয়া যায়। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা যেভাবে চূড়ান্ত হয়েছিল তার বিস্তারিত দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সমষ্টিগত মালিকানার সাথে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। আসল কথা হলো মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিরাট এলাকা বিজিত হওয়ার পর হযরত যুবায়ের (রা) ও হযরত বিলাল (রা) এবং তাঁদের সমমনা ব্যক্তিগণ গোটা এলাকার সমস্ত ভূমি ও বিষয়-সম্পত্তি খায়বারের মত বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য হযরত উমার (রা)-এর নিকট দাবী পেশ করেন। হযরত উমার (রা) তাঁদের এ দাবী মঞ্জুর করেননি। হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত মুআয্ ইবনে জাবাল (রা)-এর মত প্রবীণ সাহাবীগণ এ ব্যাপারে হযরত উমার (রা)-কে সমর্থন করেন। এ দাবী মঞ্জুর না করার কারণ কি ছিল? উল্লেখিত সাহাবীগণের এ সম্পর্কিত বক্তব্য হতে তা বুঝা যায়। হযরত মু'আয্ (রা) বলেন ঃ

"আপনি যদি তা বন্টন করে দেন তাহলে আল্লাহর কসম, তার এমন ফল হবে যা আপনি কখনও পসন্দ করবেন না। বিরাট বিরাট ও মূল্যবান ভূমি-খণ্ড সৈনিকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে। এর পর এসব সৈনিকদের মৃত্যুর পর কারো ওয়ারিস হবে কোন নারী এবং কারো ওয়ারিস হবে কোন শিশু। পরে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারার ভার গ্রহণ করবে, তাদের দেবার জন্য কিছু তখন রাষ্ট্রের হাতে অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে আজকের লোকদের জন্যও সুযোগ থাকে এবং ভবিষ্যতের লোকদের জন্যও সুযোগ থাকে।"

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

"দেশের কৃষিভূমি তার স্ব অবস্থায় থাকতে দিন যাতে তা সকল মুসলমানের অর্থনৈতিক শক্তির উৎস হতে পারে।

হযরত উমার (রা) বলেন ঃ

"এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেবো আর পরবর্তী বংশধরগণের জন্য এতে কোন অংশ থাকবে না?

.... অবশেষে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য কি থাকবে? .... তোমরা কি চাও, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কিছুই না থাকুক? ...... আর আমার আরো আশংকা হচ্ছে যে, আমি যদি তোমাদের মধ্যে তা ভাগ করে দেই তাহলে তোমরা পানি নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে।"

এর ভিত্তিতে যে ফায়সালা করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, জমি তার সাবেক মালিকদের হাতেই থাকতে দিতে হবে, তাদেরকে যিম্মী ঘোষণা করে তাদের উপর জিযিয়া ও খারাজ (কর) ধার্য করতে হবে এবং এই খারাজ মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণের কাজে খরচ করতে হবে। এ ফায়সালার খবর হযরত উমার (রা) তাঁর ইরাকের গভর্ণর হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট যে ভাষায় পাঠিয়েছিলেন তা এই যে :

فانظر ما اجلبوا به عليك فى العسكر من كراع او مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك لارضين والانهار لعمّالها ليكون ذالك فى اعطيات المسلمين، فانا لوقسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعد هم شئ -

"যুদ্ধ চলাকালে গনীমত হিসেবে সৈনিকরা যেসব অস্থাবর সম্পদ জমা করেছে এবং সৈনিকদের মধ্যে জমা হয়েছে এসব মাল তুমি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দাও। কিন্তু নদী-নালা জায়গা-জমি ঐসব লোকের কাছেই থাকতে দাও—যারা তাতে চাষাবাদ করত। তাহলে তা মুসলমানদের বেতনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা যদি এসবও আমরা বর্তমান লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেই তাহলে পরবর্তী বংশধরদের জন্য আর কিছুই থাকবে না।"[১]

এ নতুন বন্দোবস্ত দানের বুনিয়াদী মতবাদ তো এই ছিলো যে, ভূমির মালিক হবে মুসলমান এবং সাবেক মালিকদের আসল অবস্থান হবে কৃষক

১.গোটা আলোচনার জন্য দেখুন কিতাবুল খারাজ পৃঃ ২০-২১ এবং কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৭-৬৩।

হিসেবে। আর রাষ্ট্র মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সাথে লেনদেন করছে।[১] কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যিম্মী ঘোষণার পর তাদেরকে যে অধিকার দেয়া হয়েছিল তা মালিকানার অধিকার থেকে কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না। ওই সব ভূমি তাদের দখলে থাকবে যা আগে তাদের দখলে ছিল। এদের উপর মুসলমান বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে খারাজ (কর) ছাড়া আর কিছু ধার্য করা হয়নি। জমির উপর তাদের বেচা-কেনার, বন্ধক দেয়ার এবং ওয়ারিশী স্বত্বের সমস্ত অধিকার আগের মতই বহাল ছিল। এ ব্যাপারটিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) একটি আইনগত ধারার আকারে এভাবে বলেছেনঃ

> "যে দেশ রাষ্ট্রপ্রধান অস্ত্রবলে জয় করেন সেই এলাকার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে তা বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন। এ অবস্থায় তা 'উশরী' জমি হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তিনি বন্টন করা সমীচীন মনে না করেন এবং জমির পূর্বতন মালিকদের হাতে রেখে দেয়াই ভাল মনে করেন, যেমন হযরত উমার (রা) ইরাকে করেছেন, তাহলে তিনি তাও করতে পারেন। এ অবস্থায় তা হবে খারাজী জমি। খারাজ আরোপিত হওয়ার পর তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার অধিকার তাঁর থাকবে না, তার মালিক তারাই হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা একে অপরের কাছে তা হস্তান্তর করতে পারবে, পারবে বেচাকেনা করতে, তাদের উপর খারাজ ধার্য করা হবে এবং তাদের সামর্থের অতিরিক্ত বোঝা তাদের উপর চাপানো যাবে না।"
>
> (কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৩৫, ৩৬)

---

১. এই মতবাদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার উতবা বিন ফারকাদ (রা) হযরত উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে বললেন, আমি ফোরাতের কিনারের এক খণ্ড জমি খরিদ করেছি। হযরত উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছ থেকে? উতবা (রা) বললেন, এর মালিকের কাছ থেকে। উমার (রা) তখন মুহাজির ও আনসারদের দিকে ফিরে বললেন, এর মালিক তো এখানে বসা আছেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৭৪)। হযরত আলী (রা)-এর একটি কথাও এই মতবাদের উপর আলোকপাত করে। ইরাকের পুরানো জমিদারদের একজন এসে তাঁর সামনে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলে তিনি বললেন, এখন তোমার উপর থেকে জিযিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু তোমার জমি খারাজী জমি হিসেবেই থাকবে। কেননা তা আমাদের। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৮০)।

চতুর্থ প্রকারের হুকুম

উপরে বর্ণিত তিনটি শ্রেণী তো ছিল ওই সব ভূমি সম্পর্কে যা প্রথম থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মালিকানায় ছিল এবং ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর হয় এর পূর্বোক্ত মালিকানাই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, অথবা কোন কোন অবস্থায় রদবদল করা হয়ে থাকলেও তা মালিকানার ব্যাপারে করা হয়েছে, মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে রদবদল করা হয়নি। এর পর আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মালিকানাহীন জমির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ. (সা) ও তাঁর খলীফাগণ কি কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন।

এই প্রকৃতির ভূমি দুটি বড় ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ

এক—'মাওয়াত' অর্থাৎ অনাবাদী ভূমি। এ ভূমি চাই আদিউল আবাদ হোক (যার মালিক মরে গেছে) অথবা যার কোন মালিকই ছিল না, অথবা যে ভূমি ঝোপ ঝাড় কাদা মাটির পাঁক এবং প্লাবনের নীচে পড়ে গেছে।

দুই—'খালিসা' ভূমিসমূহ। অর্থাৎ খাস জমি। যার উপর সরকারী মালিকানা ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েক প্রকার ভূমি শামিল। প্রথমত, যে ভূমির মালিকগণ স্বেচ্ছায় মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে তা রাষ্ট্রের অধীন ছেড়ে দিয়েছে যে, রাষ্ট্র যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারবে।[১] দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র যে জমি থেকে মালিককে বেদখল করে খাস জমি ঘোষণা করেছে। যেমন মদীনার চারপাশে বনি নজিরের জমি। তৃতীয়ত, বিজিত এলাকার যে জমি খাস জমি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। যেমন ইরাকে পারস্য সম্রাট ও তার পরিবারের অধিকারভুক্ত ভূমি অথবা যেসব জমির মালিক যুদ্ধে মারা গেছে বা পালিয়ে গেছে হযরত উমার (রা) এ ধরনের জমিকে 'খালেসা' (খাস জমি) ঘোষণা করেছেন।[২]

এই উভয় প্রকারের জমির হুকুম আমি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করবো।

---

১. ইবনে আব্বাস (রা)—এর বর্ণনায় আছে—রাসূল করীম (সা) মদীনায় আগমন করলে আনসারগণ যেসব জমিতে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি পৌছানো যেতো না, সে সব জমি রাসূল (সা)—কে দিয়ে দিলেন যেন তিনি যেভাবে খুশী তা ব্যবহার করেন। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ২৮২)।

২. ইমাম আবু ইউসুফ ও আবু উবায়দ এই শ্রেণীর ভূমি দশ প্রকার বলে নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

চাষাবাদের ভিত্তিতে মালিকানার অধিকার

মাওয়াত–এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাচীন রীতিই বহাল রাখেন যার ভিত্তিতে দুনিয়ায় জমির মালিকানার সূচনা হয়েছে। মানুষ যখন এ ভূমণ্ডলে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে যে, যেখানে যে আছে, সে জায়গা তার। আর কোন জমি যে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে ব্যবহারের উপযোগী করেছে তা কাজে লাগাবার অধিকার তারই বেশী। প্রকৃতির সকল অবদানের উপর মানুষের মালিকানার অধিকারের এটাই হলো বুনিয়াদী মূলনীতি। রাসূলে করীম (সা) বিভিন্ন সময়ে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথারই সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من عَمَّرَ ارضًا ليست لاحد فهو احق بها – قال عروة قضى به عمر فى خِلَافتِهِ – (بخارى – احمد – نسائى)

"হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মালিকানাহীন কোন জমি আবাদযোগ্য করে সে ব্যক্তিই সে জায়গার হকদার। উরওয়া বিন জুবায়ের বলেছেন, হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে এর উপরই আমল করেছেন।" (বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ)।

عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال مَن احيى ارضاً مَيْتَةً فهى له (احمد – ترمذى – نسائى – ابن حبان)

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত (অনাবাদী) ভূমি জীবিত (আবাদযোগ্য) করেছে সে জমি তার।" (তিরমিযি, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)

عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارضٍ فَهِىَ له – (ابو داود)

"সামুরা বিন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী ভূমির উপর নিজের সীমারেখা টেনে নেয় সে ভূমি তার।" –(আবু দাউদ)।

عن اسمر بن مضرس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من سبق الى ماء لم يسبقه اليه مسلم فهو له (ابو داود)

"আসমার বিন মুদাররিস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন কূপ পায় যা এর আগে কোন মুসলিমের দখলে আসেনি সে কূপ তার।" –(আবু দাউদ)

عن عروه قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض ارض الله – والعباد عبادالله – ومن احيى امواتا فهو احق بها – جاءنا بهذا عن النبى صلى الله عليه وسلم الذين جاؤا بالصلوات عنه (ابو داود)

"উরওয়া বিন যুবাইর (তাবেঈ) বলছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ(সা) ঘোষণা দিয়েছেন, জমি আল্লাহর, আর বান্দারাও আল্লাহর। যে ব্যক্তি কোন পতিত জমি আবাদ করে সে ব্যক্তিই সে জমির হকদার। যে সব প্রবীণ ব্যক্তিদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা এসে পৌছেছে তাদের মাধ্যমেই (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম) রাসূল(সা)–এর নিকট হতে এ নীতি আমাদের কাছে এসে পৌছেছে।" – (আবু দাউদ)।

এই প্রাকৃতিক নীতিমালা পুনর্বহাল করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য দুটি বিধান নির্দিষ্ট করেছেন। একটি হলো, যে ব্যক্তি অন্যের মালিকানার জমি চাষাবাদ করে, এ চাষাবাদের কারণে সে জমির মালিকানার হকদার বলে দাবী করতে পারবে না। দ্বিতীয় হলো, যে ব্যক্তি অযথা কোন ভূমির চৌহদ্দি টেনে বা নিশান টাঙ্গিয়ে ভূমিকে নিজের মালিকানায় আটকিয়ে রাখে এতে কোন প্রকার চাষাবাদ করে না, তিন বছর পর তার মালিকানার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। প্রথম বিধানকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عـــن سـعـيـد بن زيـد قال قال رسـول الـلـه صـلـى عـلـيـه وسـلـم مـــن احـيـى ارضـا بـعـد مـيـتـة - فـهـى لـه وليـس لـعـرق ظـالـم حـق -

"হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি জীবিত (আবাদযোগ্য) করেছে সে জমি তার। আর অপরের জমিতে নাজায়েয পদ্ধতিতে আবাদকারীর জন্য কোন কিছু নেই।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ)

দ্বিতীয় বিধানের উৎস হলো নিম্ন বর্ণিত হাদীস

عـــن طـاوس قـال قـــال رســـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم عـادى الارض لـلـه ولـلـرسـول ثـم لـكـــم مـن بـعـد فـمـن احـيـى ارضًـا مـيـتـةً فـهـى لـه ولـيـس لـمـحـتـجـر حـق بـعـد ثـلـث سـنـيـن -

"তাউস তাবেঈ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মালিক বিহীন পতিত জমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা), এরপর তা তোমাদের জন্য। অতএব যে কেউ পতিত জমি আবাদযোগ্য করবে তা তার। তিন বছর পর্যন্ত অনাবাদী ফেলে রাখার পর মালিকের এতে আর কোন হক থাকে না।" (আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)।

عن سـالـم بـن عـبـد الـلـه ان عـمـربـن الـخـطـاب رضـى الـلـه عـنه قـال عـلى الـمـنـبـر مـن احـى ارضـا مـيـتـة فـهـى لـه ولـيـس لـمـحـتـجـر بـعـد ثـلـث سـنـيـن وذالـك ان رجـالا كـانـوا يـحـتـجـرون مـــن الارض مـالا يـعـمـلـون - (ابـويـوسـف كـتـاب الـخـراج)

"হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমার (রা) মিম্বারে উঠে এক ভাষণে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পতিত অনাবাদী জমিকে চাষাবাদযোগ্য করে সে জমি তার। কিন্তু অনাহতভাবে যারা জমি আটকে রাখে তিন বছর পর এতে তার কোন অধিকার থাকবে না। সে

সময় কেউ কেউ কোন চাষাবাদ না করে এমনিতেই জমি আটকিয়ে রাখতো এ কারণে এ ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।"

(আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ)

এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। মতভেদ যদি থাকে তবে আছে এ ব্যাপারে যে, আবাদযোগ্য করার দ্বারাই কি কোন ব্যক্তি পতিত জমির মালিক হয়ে যায়? অথবা মালিকানা প্রমাণের জন্য সরকার থেকে অনুমতি প্রয়োজন? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) রাষ্ট্রের অনুমতি প্রয়োজন মনে করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) প্রমুখের মত হলো এ সম্পর্কে হাদীস একেবারেই সুস্পষ্ট। তাই আবাদকারীর মালিকানার অধিকারের জন্য রাষ্ট্রের নিকট হতে অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া হক অনুযায়ী আবাদকারী এ জমির মালিক হয়ে যাবে। এরপর ব্যাপারটা যখন রাষ্ট্রের নিকট পেশ হবে তখন এর কাজ হবে আবাদকারীর হককে মেনে নেয়া। আর যদি এ নিয়ে কলহ বাধে তাহলে তার হকই বলবৎ রাখবে। ইমাম মালেক (র) জনবসতির নিকটবর্তী জমি ও দূরবর্তী অনাবাদী জমির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে প্রথম প্রকারের জমি এ নির্দেশের আওতাধীন নয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের জমির জন্য সরকারের অনুমোদন শর্ত নয়। শুধু আবাদ করার মাধ্যমেই সে এর মালিক হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে হযরত উমার (রা) ও হযরত উমার বিন আবদুল আযীয (র)–এর কর্মনীতি এই ছিল ঃ "যদি কোন ব্যক্তি কোন জমি পরিত্যক্ত মনে করে আবাদ করে নেয় এবং এর পর কেউ এসে এর মালিকানা দাবী করে বসে তবে এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে এখতিয়ার দেয়া হবে যে, হয় আবাদ করার জন্য প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে জমি নিজে নিয়ে নেবে, অথবা জমির মূল্য নিয়ে মালিকানার অধিকার তার নিকট হস্তান্তর করবে। [১]

১. বিস্তারিত অবগত হবার জন্য ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ' পৃঃ ৩৬ ও ৩৭ এবং আবু উবায়দের 'কিতাবুল আমওয়াল' পৃঃ ২৮৫–২৮৯ দেখুন। কানযুল উম্মালে শায়খ আলী মোত্তাকী এ বিষয়ের উপর বর্ণিত সব হাদীস এক স্থানে জমা করেছেন। যারা এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা অবগত হতে চান, উল্লেখিত কিতাবের ২য় খণ্ড এহইয়ায়ে মাওয়াত অধ্যায় দেখে নিন।

সরকারের তরফ থেকে প্রদত্ত জমি

অতপর 'মাওয়াত' (পতিত) ও 'খালেসা' (খাস) উভয় প্রকারের ভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণ জমি রাসূলে কারীম (সা) নিজে মানুষকে দান করেছেন এবং তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীনও অনবরত এ ধরনের দান করতে থাকেন। এসব দানের অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

(১) উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা) বর্ণনা করেছেন –হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ও হযরত উমার (রা)–কে কিছু জমি দান করেছিলেন। হযরত উসমান (রা)–এর সময়ে হযরত যুবাইর (রা) উমারের ওয়ারিসগণ থেকে তাদের অংশের জমি খরিদ করে নিয়েছিলেন। আর এ খরিদকে মজবুত করার জন্য হযরত উসমান (রা)–এর নিকট হাজির হলেন এবং বললেন, হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, রাসূলে করীম (সা) এ জমিগুলো আমাকে ও হযরত উমার (রা) বিন খাত্তাবকে দান করেছিলেন। অতপর আমি উমার (রা)–এর বংশধরদের নিকট হতে তাঁর অংশ খরিদ করে নিয়েছি। এ কথা শুনে হযরত উসমান (রা) বললেন, 'আবদুর রহমান সত্য সাক্ষ্য দেবার মতো লোক। সে সাক্ষ্য তার পক্ষে হোক অথবা বিপক্ষে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

(২) আলকামা বিন ওয়ায়েল তাঁর পিতা হযরত ওয়ায়েল বিন হুজার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে হাদ্বরামাউতে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

(৩) হযরত আবু বকর (রা)–এর কন্যা হযরত আসমা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) তাঁর স্বামী যুবাইরকে খায়বারে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। এতে খেজুর গাছসহ অন্যান্য গাছপালাও ছিল। তাছাড়া উরওয়া বিন যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) তাকে বনী নযীবের জমি থেকে এক খণ্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, জমির একটি বড় খণ্ড রাসূলুলাহ (সা) হযরত যুবাইরকে দান করেছিলেন। এ দান ছিল এত বড় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন,

'ঘোড়া দৌড়াতে থাকো। যেখানে গিয়ে তোমার ঘোড়া থেমে যাবে ততদূর পর্যন্ত সব জমি তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে। তাই তিনি ঘোড়া দৌড়ালেন। এক জায়গায় গিয়ে ঘোড়া থামলে তিনি তার হাতের চাবুক সামনে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, বেশ, চাবুক যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখান পর্যন্ত ভূমি তাকে দিয়ে দেয়া হোক। (বুখারী, আহ্‌মদ, আবু দাউদ, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ, আবু উবায়দের কিতাবুল আমওয়াল)।

(৪) হযরত উমার বিন দীনার বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমনের পর হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমার (রা) উভয়কে ভূমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ–ইমাম আবু ইউসুফ)।

(৫) হযরত আবু রাফে' (রা) বর্ণনা করেছেন–নবী করীম (সা) তাঁর খান্দানের লোকজনকে একটি জমি দান করেছিলেন, কিন্তু তারা তা আবাদযোগ্য করতে পারেননি। হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে সে জমি আট হাজার দীনার মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। (কিতাবুল খারাজ)।

(৬) ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আনসার সম্প্রদায়ের এক জয়তুন ব্যবসায়ীকে এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। ভূমি খণ্ডটির দেখাশুনার জন্য তিনি প্রায়ই বাইরে যেতেন। ফিরে এসে শুনতে পেতেন যে, তিনি বাইরে যাবার পর মহানবী (সা)–এর উপর এতটুকু এতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই এই হুকুম জারি করেছেন, এতে তাঁর মনে দুঃখ হতো। অবশেষে একদিন তিনি রাসূলে করীম (সা)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, এ জমি আমার আর আপনার মধ্যে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জমিটি আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে জমি ফেরত নেয়া হল। এর পর হযরত যোবায়ের (রা) জমিটির জন্য আবেদন করলে তনি তা তাঁকে দিয়ে দিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল)

(৭) হযরত বিলাল বিন হারেস মুযানী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আকীকের সমস্ত জমি দান করে দিয়েছিলেন।

(কিতাবুল আমওয়াল)

(৮) হযরত আদী বিন হাতিম (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফোরাত বিন হাইয়ান আজালীকে ইয়ামামার এক খণ্ড জমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল)

(৯) আরবের বিখ্যাত চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহর ছেলে নাফে' হযরত উমার (রা)–এর নিকট বসরা এলাকার এমন একটি জমির জন্য আবেদন জানালেন যা খারাজমুক্ত ভূমির অন্তর্ভূক্ত ছিল না, আবার মুসলমানদের কোন স্বার্থের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল না। তিনি বললেন, আমি এ ভূমিতে ঘোড়ার জন্য ঘাসের চাষাবাদ করবো। হযরত উমার (রা) বসরার গভর্ণর আবু মূসা (রা)–এর নিকট ফরমান লিখে জানালেন, যদি নাফে'র বর্ণনা ঠিক হয় তাহলে জমিটি তাকে দিয়ে দেয়া হোক। (কিতাবুল আমওয়াল)

(১০) মূসা বিন তালহা (র) বলেছেন, হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে যুবাইর (রা) বিন আওয়াম, সাআদ (রা) ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) উসামা (রা) বিন যায়েদ, খাব্বাব বিন আরাত, আম্মার (রা) বিন ইয়াসির এবং সা'দ বিন মালেককে জমি দান করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল আমওয়াল)

(১১) আবদুল্লাহ বিন হাসান (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) আবেদন জানালে হযরত উমার (রা) তাঁকে 'ইয়াম্বু'র' এলাকা দান করেছিলেন (কানযুল উম্মাল)।

(১২) ইমাম আবু ইউসুফ (র) বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন, পারস্যের শাসক কিসরা ও তার বংশধরগণের যেসব জমি অনাবাদী পতিত ছিল অথবা যে জমির মালিক পালিয়ে গিয়েছিল অথবা নিহত হয়েছিল অথবা যেসব জমি কাদামাটি, প্লাবন বা ঝোপ ঝাড়ের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল সে সব জমিকে 'খালেসা' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যাকে তিনি জমি দান করতেন এসব জমি হতেই দান করতেন। (কিতাবুল খারাজ)

ভূমি দান করার শরয়ী আইন

ভূমি প্রদানের এ রীতি শুধু রাজকীয় ইন্‌আম ও বখশিশ ধরনেরই ছিল না। বরং এর কিছু নীতিমালাও ছিলো যা আমরা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাই।

প্রথম নিয়ম ঃ যে ব্যক্তি ভূমি লাভ করে তা কোন কাজে না লাগালে এই দান বাতিল গণ্য হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'মুজাইনা' ও 'জুহাইনা' বংশের লোকজনদেরকে কিছু জমি দান করেন। কিন্তু তারা সে জমিকে বেকার ফেলে রেখেছিলো। অতপর অন্য কিছু লোক এসে সে জমি আবাদ করে। 'মুজাইনা' ও 'জুহাইনার' লোকেরা উমার (রা)–এর খিলাফতকালে তাঁর নিকট দাবী নিয়ে এলো। হযরত উমার (রা) বললেন, "এ জমি যদি আমার অথবা আবু বকর (রা)–এর দান হতো তাহলে আমি এ দান বাতিল করে দিতাম। কিন্তু এ দান তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)–এর। অতএব আমি অপারগ। অবশ্য পদ্ধতি হলো এই ঃ

من كانت له ارض ثم تركها ثلث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم اخرون فهم احق بها –

"যার কোন ভূখণ্ড থাকবে। আর তিন বছর পর্যন্ত সে তা অনাবাদী ফেলে রাখবে। এরপর যদি কেউ তা আবাদ করে নেয় তাহলে এরাই এ ভূমির হকদার।"

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ যে দান সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না সেই দানের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। নজীর হিসেবে আবু উবায়দ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে এবং ইয়াহ্‌ইয়া বিন আদাদ তাঁর খারাজ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল বিন হারেছ মুযানীকে গোটা আকীক উপত্যকা দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার একটা বড় অংশ আবাদ করতে পারেননি। এ অবস্থা দেখে হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ জমি তোমাকে এ জন্য দান করেননি যে, তুমি নিজেও তা ব্যবহার করবে না আর অন্যদেরকেও তা ব্যবহার করতে দিবে না। এখন তুমি শুধু এতটুকু জমি রাখ যতটুকু ব্যবহার করতে পারবে। বাকী জমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি এগুলোকে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দেই। বিলাল বিন হারিস (রা) তাতে অসম্মত হলেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে আবার বললেন। অবশেষে যতটুকু জমি তাঁর চাষের আওতায় ছিল ততটুকু বাদ দিয়ে বাকী জমি তাঁর থেকে ফেরত নিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

তৃতীয় নিয়ম ঃ রাষ্ট্র শুধু 'মাওয়াত' (পতিত) এবং 'খালিসা' (খাস) জমি থেকেই দান করতে পারেন। এক ব্যক্তির ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে অপর ব্যক্তিকে দান করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। অথবা মূল মালিকদের মাথার উপর অনাহুত আর এক ব্যক্তিকে জায়গীরদার বা জমিদার বসিয়ে দিয়ে তাকেই মালিকানার অধিকার দান করে তার অধিনে মূল মালিকদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে গণ্য করার অধিকারও সরকারের নেই।

চতুর্থ নিয়ম ঃ রাষ্ট্র শুধু তাদেরই জমি দান করতে পারেন যারা সত্যিকারে জনসাধারণের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। অথবা যার সাথে এ ধরনের কোন সেবামূলক কাজ সংশ্লিষ্ট হয়েছে অথবা যাকে দান করা কোন না কোনভাবে জনস্বার্থের জন্য সমীচীন মনে করা হবে। এখন রইলো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ওই সব রাজকীয় দান যা খোশামোদ প্রিয় ও তোষামোদকারীদেরকে দেয়া হয়, অথবা ওই সব দান যা অত্যাচারী ও উৎপীড়করা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দান করে থাকে। এসব দান কোন অবস্থাতেই বৈধ দানের পর্যায়ে আসতে পারে না।

জায়গীরদারীর সঠিক শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

শেষোক্ত দুটি মূল নীতির ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত কর্মপদ্ধতি। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তাঁর কিতাবুল খারাজে এ বিষয়ের এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"ন্যায় পরায়ণ শাসকের অধিকার আছে,—যে সম্পদের কোন মালিক নেই এবং যার কোন উত্তরাধীকারও নেই এমন সম্পদ তিনি এমন লোককে দান বা উপঢৌকন হিসেবে দিতে পারেন, ইসলামের খেদমতে যার অবদান আছে। সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন প্রশাসন যে ব্যক্তিকে কোন ভূখন্ড দান করবেন তা ফেরত নেবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু কোন ভূমি কোন শাসক কারো থেকে ছিনিয়ে এনে অন্যকে দান করলে তা হবে এক জনের জিনিস আত্মসাৎ করে এনে অন্যকে দান করার শামিল।"

এরপর তিনি আবার লিখেছেন ঃ

"অতএব যে যে ধরনের ভূমি শাসক দান করতে পারেন বলে আমি উল্লেখ করেছি, তার থেকে যে ভূমিই ইরাক, আরব এবং আলজিবাল ও অন্যান্য এলাকায় ন্যায়পরায়ণ ও সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসক কাউকে দান করে থাকেন পরবর্তী খলীফাগণের পক্ষে তাদের থেকে তা ফিরিয়ে আনা অথবা তাদের দখল থেকে তা বের করে আনা, যদি ভূমি এতদিন তাদের দখলে ছিল, হালাল নয়, চাই তারা এ সম্পদ উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত হোক অথবা ওয়ারিস থেকে কিনে থাকুক।"

অবশেষে অধ্যায়টি সমাপ্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"অতএব এসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও জমি দান করেছেন এবং তাঁর পরে খলীফাগণও দান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ যাকেই দান করেছেন, এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল দেখেই দান করেছেন। যেমন কোন নওমুসলিমের মন জয় করা অথবা জমি আবাদযোগ্য করা। এভাবে খোলাফায়ে রাশেদাও যাকে জমি দান করেছেন, ইসলামে তার কোন না কোন উত্তম খেদমত দেখেই দিয়েছেন অথবা ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় তা কোন কাজে আসবে মনে করেই করেছেন। অথবা এতে কল্যাণ নিহিত আছে বলে করেছেন।"

(কিতাবুল খারাজ ৩২-৩৫ পৃঃ)

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়গীরদারীর মূল অবস্থান কি? একজন শাসক কি পরিমাণ জায়গীর দিতে পারেন ও বিলোপ করতে পারেন? আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের এসব প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ বিশ্লেষণী জবাব দেন। এর যে জবাব ইমাম সাহেব দিয়েছেন তার সারমর্ম হলো—রাষ্ট্রের তরফ থেকে ভূমি দান করা তো স্বস্থানে একটি বৈধ কাজ। কিন্তু সকল ভূমি দানকারী এক রকম নয় আবার সকল ভূমি গ্রহণকারীও এক সমান নয়। এক রকম দান, ন্যায়পরায়ণ, দীনদার, সত্যপথের পথিক ও আল্লাহভীরু শাসকগণ করে থাকেন। ইনসাফের দৃষ্টিতে দীন ও মিল্লাতের সঠিক খাদেমদেরকে দান করেন। অথবা অন্তত এমন লোকদেরকে দান করেন যারা হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী। এমন উদ্দেশ্যে

দান করেন যার ফলাফল সামষ্টিকভাবে দেশ ও জাতিই ভোগ করে থাকে। আর এমন সম্পদ থেকে দিয়ে থাকেন যার থেকে দান করা তাঁর জন্য বৈধ। দ্বিতীয় প্রকার দান হলো—যা অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও স্বার্থপূজারী শাসক দান করে থাকে, অসৎ উদ্দেশ্যে অসৎ লোকদের দান করে থাকে। অন্ধভাবে এমন সম্পদ থেকে দান করে যা দেবার তার অধিকার ছিল না। এ দুটি দুই বিপরীত ধরনের দান। আর দুটি দানের একরকম হুকুম নয়। প্রথম দান বৈধ। এ দানকে বহাল রাখাই ইনসাফের দাবী। আর দ্বিতীয় প্রকারের দান অবৈধ এবং ইনসাফের দাবী হলো তা বাতিল করা। যে ব্যক্তি এই উভয় দানকে একই পাল্লায় ওজন করে সে বড়ই যালেম।

মালিকানা অধিকারের মর্যাদা

এসব সাক্ষ্য ও নজির সেই গোটা সময়ের কার্যক্রমের নমুনা পেশ করে যখন কুরআনের মূল উদ্দেশ্য স্বয়ং কুরআন বাহক মহানবী (সা) এবং তাঁর সরাসরি ছাত্রগণ নিজেদের কথা ও কাজে প্রতিফলিত করেছিলেন। এই নমুনা অবলোকন করার পর কারো পক্ষে এই সন্দেহ প্রকাশ করারও অবকাশ থাকে না যে, ভূমিকে ব্যক্তি মালিকানা হতে বের করে এনে সামষ্টিক মালিকানায় নিয়ে আসাই ছিল ইসলামের মূলনীতি। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত এই নমুনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জমি থেকে লাভবান হওয়ার স্বভাবিক ও সঠিক পন্থা কেবল মাত্র এই যে, তা জনগণের ব্যক্তি মালিকানায় থাকবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময়ে শুধু সাবেক মালিকানাকেই বহাল রাখেননি বরং যেসব অবস্থায় তিনি সাবেক মালিকানা বাতিল ঘোষণা করেছেন সেখানেও আবার নতুনভাবে ব্যক্তি মালিকানা সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য মালিকানাহীন ভূমির উপরে নতুন মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছেন এবং নিজের সরকারী মালিকানাধীন ভূমি জনগণের মধ্যে বন্টন করে তাদেরকে মালিকানার অধিকার দান করেছেন। এটা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাবেক মালিকানা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র একটি অনুপেক্ষণীয় নিকৃষ্ট পন্থা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়নি, বরং একটি সঠিক নীতি

হিসেবেই এ ব্যবস্থাকে বহাল রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্যও এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) মালিকানার অধিকারের মর্যাদা সম্পর্কে যেসব হুকুম দিয়েছেন সেগুলো এ কথার আরো অতিরিক্ত প্রমাণ। বিভিন্ন বরাতে ইমাম মুসলিম (র) এই রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমার (রা)–এর ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদ (রা)–এর বিরুদ্ধে এক মহিলা মারওয়ান বিন হাকামের সময়ে দাবী উত্থাপন করেছেন যে, তিনি তার জমির একটি অংশ জবরদখল করে নিয়েছেন। জবাবে সাঈদ (রা) মারওয়ানের আদালতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা এই যে, "আমি তার জমি কিভাবে ছিনিয়ে নিতে পারি। যেখানে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর মুবারক জবানে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ–

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও দখল করে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি হার বানিয়ে তার ঘাড়ে লটকিয়ে দেয়া হবে।"

এই একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হাদীস ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও আয়েশা (রা)–এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন (মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল–মুজারাআ, বাবু তাহরীমিয যুলমি ওয়া গাসাবিল আরদি)। ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী বিভিন্ন সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "কোন অধিকার ছাড়া (মালিকের অনুমতি না নিয়ে) অন্যের জমি চাষাবাদকারীর কোন প্রাপ্য নেই।"

রাফে' বিন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

من زرع فى ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئٌ

وله نفقة – (ابو داود – ابن ماجة – ترمزى)

"কোন ব্যক্তি অন্যের জমি তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করলে ঐ ক্ষেতের ফসলের উপর তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। অবশ্য তার (চাষাবাদের) খরচ তাকে দিয়ে দিতে হবে।"

(আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

উরওয়া বিন যুবাইর (রা)–এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হলো যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর জমিতে খেজুর গাছ লাগিয়েছে। এ মোকদ্দমার রায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ফায়সালা দিলেন—এসব খেজুর গাছ উপড়িয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং জমি মূল মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এসব নির্দেশ কিসের সাক্ষ্য দেয়? এ কথার কি যে, ভূমির ব্যক্তি মালিকানা কোন ক্ষতিকর জিনিস ছিল যার মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অনুপেক্ষণীয় মনে করে বাধ্য হয়ে সহ্য করা হয়েছে? অথবা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এটা ছিল সম্পূর্ণ একটি বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার যার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে?

ভাগচাষ(মুযারাআ)

এখন আমরা সেই সব হাদীসের পর্যালোচনা করবো যা থেকে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শরীয়াত জমির ব্যক্তি মালিকানাকে শুধুমাত্র নিজে চাষাবাদ করতে পারার মত পরিমাণ পর্যন্ত সীমিত করে দিতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে জমি ভাগচাষে দেয়া এবং নগদ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। বিষয়টির পূর্ণ পর্যালোচনার জন্য আমরা প্রথমে সেইসব হাদীস পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করবো যার উপর এই ধারণার ভিত্তি স্থাপিত। অতপর এসব হাদীসের পর্যালোচনা করে আমরা জানতে চেষ্টা করব যে, এ বিষয়ে শরীয়াতের আসল হুকুম কি?

হাদীসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস করলে জানা যায় যে, যেসব বর্ণনায় জমি ভাগচাষ অথবা নগদ বিক্রির নিষেধাজ্ঞা এসেছে অথবা যেসব হাদীসে নিজে চাষাবাদ করতে পারার অতিরিক্ত জমি অন্যদের বিনামূল্যে চাষাবাদ করতে দিতে অন্যথায় নিজের কাছে রেখে দেয়ার নির্দেশ এসেছে তা ছয় জন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে। তাঁরা হলেন (১) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা), (২) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), (৩) হযরত আবু হুরাইরা (রা), (৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), (৫) হযরত যায়েদ বিন সবিত (রা) এবং (৬) হযরত সাবিত বিন দ্বাহহাক (রা)। বর্ণনার সহজতার জন্য আমি এঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা পৃথক পৃথক উদ্ধৃত করছি।

রাফে' বিন খাদীজ (রা)—এর রিওয়ায়াত

এ ব্যাপারটি যে সাহাবীর দ্বারা সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তিনি হলেন, হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)। এ কারণে তাঁর রিওয়ায়েতই এখানে প্রথম উদ্ধৃত করা হলো।

(১) হযরত রাফে' (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে চাষাবাদের জন্য জমি লাগিত নিতাম। এক–তৃতীয়াংশ, এক–চতুর্থাংশ বা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বিনিময় হিসেবে ঠিক করে নিতাম। একদিন

আমার চাচাদের একজন এলেন এবং তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এমন একটা কাজ করতে বারণ করে দিলেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ আমাদের জন্য বেশী লাভজনক।

نهانا ان نحاقل بالارض فنكر يها على - الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كرائها وما سوى ذالك -

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে জমি ভাগচাষে দিতে এবং এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শষ্যের বিনিময়ে কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি হুকুম দিয়েছেন, জমির মালিক হয় নিজে তা চাষাবাদ করবে অন্যথায় অন্যকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়ে দেবে। তিনি জমি ভাড়ায় দিতে এবং এছাড়া অন্য পন্থাও অপসন্দ করেছেন।"

–(মুসলিম)

(২) অন্য এক বর্ণনায় হযরত রাফে' (রা) নিজের চাচার নাম যোহাইর বিন রাফে' উল্লেখপূর্বক বলেছেন যে, তাঁকে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা তোমাদের ক্ষেতখামার কিভাবে চাষাবাদ কর? তিনি চাষাবাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিলে হুযূর (সা) বললেন ঃ

فلا تفعلوه ازرعواها او ازرعوها اوامسكوها -

"তোমরা এরূপ করো না। হয় নিজেরা চাষাবাদ করো অথবা অন্যকে চাষাবাদের জন্য দিয়ে দাও (বিনিময় ব্যতীত), অথবা নিজের কাছে জমি রেখে দাও।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)।

(৩) অপর এক বর্ণনায় হযরত রাফে' (রা) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নিজের জমিতে পানি দিচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কার ফসল এবং কার জমি?

রাফে' (রা) বললেন ঃ

زرعى ببذرى وعملى – لى الشطر ولبنى فلان الشطر –

"ফসল আমার। এতে বীজ ও শ্রম আমার। ফসলের অর্ধেক আমার আর অর্ধেক অমুক গোত্রের।"

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

اربيتما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك –

"তুমি সূদী কারবার করেছো। জমি তার মালিকদের ফিরিয়ে দাও এবং তোমার খরচ তাদের থেকে নিয়ে নাও।" (আবু দাউদ)[১]

(৪) মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা) বলেছেন ঃ

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرٍ كان لنا نافعاً اذا كانت لاحدنا ارضٌ ان يعطيها ببعض خراجها وبدا رهم وقال اذا كانت لاحدكم ارضٌ فليمنحها اخاه او ليزرعها –

"রাসূলে করীম (সা) আমাদেরকে এমন এক কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। অর্থাৎ আমাদের কারো কাছে যদি জমি থাকে তাহলে জমির উৎপাদন অথবা নগদ অর্থের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য অন্য কোন লোককে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বললেন ঃ তোমাদের কারো নিকট জমি থাকলে তা হয় সে নিজের কোন ভাইকে বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করতে দেবে; অথবা নিজে চাষাবাদ করবে।" (তিরমিযী)

(৫) সাঈদ বিন মুসাইয়েব (র) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

---

১. এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন বকর বিন আমের আল বাজালী। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সমালোচিত (দেখুন নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, ২৩৪ পৃঃ)

وقال انما يزرع ثلثة رجل له ارض فيزرعها - ورجل منح ارضا فهو يزرع مامنح - ورجل استكرى ارضًا بذهب اوفضة

"রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাকালা (ভাগে চাষাবাদ করা) এবং মুযাবানা (গাছে খেজুর রেখে বিক্রি করা) নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ চাষাবাদ তিন ব্যক্তি করতে পারে। যার নিজের জমি আছে এবং তাতে সে নিজে চাষাবাদ করে, যাকে কেউ এমনিই কিছু জমি দিয়ে দেয় এবং তাতে সে চাষাবাদ করে। যে ব্যক্তি সোনা রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া নেয়।"
(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

কিন্তু ইমাম নাসাঈ অপর এক বর্ণনার ভিত্তিতে বলেছেন যে, এই হাদীসের শুধু প্রথম অংশ অর্থাৎ نهى عن المحاقلة والمزابنة রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী। বাকী অংশটুকু সাঈদ বিন মুসাইয়েবের নিজের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। যা পরে মূল হাদীসের সাথে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

(৬) সোলায়মান বিন ইয়াসার (র) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি তাঁর কোন চাচাঁর এ কথা নকল করেছেন যে, তিনি এসে এ কথা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من كانت له ارضٌ فلا يكر بها بطعام مسمى

"যার কিছু জমি আছে সে যেন শষ্যের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তা কেরায়া না দেয়।"

অপর এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, তাঁর চাচা বর্ণনা করেছেন ঃ

من كانت له ارضٌ فليزر عها او ليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى -

"যার কিছু জমি আছে তা হয় সে নিজে চাষাবাদ করবে অথবা তার কোন ভাইকে চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেবে। কিন্তু তা ভাড়ায় দিতে পারবে না। এক–তৃতীয়াংশ, এক–চতুর্থাংশ বা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শষ্যের বিনিময়ে।"

(৭) হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর ছেলে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু রাফে' রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট-হতে ফিরে এসে আমাদেরকে বলেছেন :

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله ارفق،نهانا ان يزرع احدنا الا ارضا يملك رقبتها او منيحة يمنحها رجل -

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এমন এক কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ আমাদের জন্য আরো বেশী লাভজনক। তিনি আমাদেরকে কারো জমিতে চাষাবাদ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু যদি তার নিজের মালিকানার জমি হয় অথবা কেউ তাকে বিনিময় ছাড়া চাষাবাদ করতে দিয়ে থাকে (তবে তা স্বতন্ত্র কথা)।" (আবু দাউদ)

(৮) হযরত ইবনে উমার (রা) বলেছেন : আমরা আমাদের জমি ভাড়ায় খাটাতাম। এরপর আমরা যখন রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর হাদীস শুনলাম তখন থেকে এ কাজ ছেড়ে দিলাম। অন্য এক বর্ণনায় ইবনে উমার (রা) বলেছেন, "আমরা 'মুখাবারা' (ভাগে চাষাবাদ করার কাজ) করতাম। এতে কোন দোষ আছে বলে মনে হতো না। তারপর রাফে' (রা) দাবী করলেন যে, আল্লাহর নবী (সা) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাই আমরা তাঁর কথা শুনে তা ছেড়ে দিলাম।" (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা)—এর রিওয়ায়াত

হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর পরে এ সংক্রান্ত হুকুমের দ্বিতীয় বড় উৎস হলো হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা)-এর রিওয়ায়াত। তাঁর থেকে নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে :

(١) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض -

'রাসূলুল্লাহ (সা) জমি কেরায়া (ভাড়া) দিতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

(٢) نهى عن المخابرة –

"রাসূলে করীম (সা) মুখাবারা (ভাগে চাষাবাদ) নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

(٣) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توخذ الارض اجرًا اوحظًا –

"রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা উৎপাদনের অংশ প্রদানের শর্তে চাষাবাদের জন্য জমি নিতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম)"।

(٤) من كانت له ارض فليزر عها فان لم يزرعها فليزر عها اخاه –

"যার কিছু জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে। আর যদি নিজে চাষাবাদ না করে তবে তা যেন তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়েদেয়।"

এ হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দ সহকারে এসেছে। আরেকটি বর্ণনার শব্দ হলো :

من كانت له فضل ارضٍ فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه –

"যার কাছে অতিরিক্ত জমি আছে তা হয় সে নিজে চাষাবাদ করবে অথবা তার কোন ভাইকে দিয়ে দিবে। সে যদি কাউকে দিতে না চায় তাহলে তা নিজের কাছে রেখে দেবে।"

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : فليهبها اوليعرها "সে যেন তা দান করে, অথবা ধার দেয়।"

আরো এক বর্ণনায় আছে : لا يواجرها اياه "অবশ্যই তা যেন বিনিময়ের ভিত্তিতে না দেয়।"

অপর বর্ণনায় আছে ঃ ولا يكريها "তা যেন কেরায়ায় (ভাড়ায়) না দেয়।" (মুসলিম, বুখারী, ইবনে মাজাহ)

(৫) نهى عن بيع ارض البضاء سنتين او ثلاثا –

"রাসূলুল্লাহ (সা) খালি জমিকে দু'তিন বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"

অপর বর্ণনায় আছে ঃ عن بيع السنين "কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিধেষ করেছেন।"

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ عن بيع ثمر سنين "কয়েক বছরের ফল অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

(৬) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول –

"আমি (জাবের) রাসূলুল্লাহ (সা)–কে মুযাবানা ও মুহাকালা নিষেধ করতে শুনেছি।"

তারপর স্বয়ং হযরত জাবের (রা) মুযাবানার ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হলো "গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা খোর্মার বিনিময়ে বিক্রি করা আর মুহাকালার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হলো জমি (নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য প্রদানের শর্তে) কেরায়ায় (ভাড়া) দেয়া।" (মুসলিম)

(৭) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليونن لحرب من الله ورسوله –

"আমি রাসূলে করীম (সা)–কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুখাবারা (ভাগচাষ) ত্যাগ না করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রইল।" (আবু দাউদ)

একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কতিপয় হাদীস

অবশিষ্ট চার জন সাহাবীর বর্ণনা যা উল্লেখিত হাদীসগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তা নীচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ارض فليزر عها او ليمهحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه –

"রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যার জমি তা সে হয় নিজে চাষাবাদ করবে অথবা তার কোন ভাইকে বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করতে দিবে। কিন্তু যদি সে তা দিতে না চায় তাহলে যেন তা নিজের কাছে রেখে দেয়।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

نهى عن المحاقلة المزا بنة –

"রাসূলে করীম (সা) মুহাকালা ও মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত ঃ

نهى عن المزابنة والمحاقلة – والمزابنة اشتراء الثمر فى رووس النخل – والمحاقلة كراء الارض –

"হুযূর (সা) মুযাবানা ও মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুযাবানা হলো গাছের মাথায় থাকতেই খেজুরের বেচা-কেনা করা এবং মুহাকালার অর্থ হলো—জমি কেরায়ায় দেয়া।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

হযরত সাবেত বিন যাহহাক (রা) হতে বর্ণিত ঃ

نهى عن المزارعة –

"রাসূলুল্লাহ (সা) মুযারায়াত (ভাগচাষ) নিষিদ্ধ করেছেন" (মুসলিম)।

যায়েদ বিন সাবেত (রা) হতে বর্ণিত ঃ

نـهـى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة - قلت

وما المخابرة قال ان تاخذ الارض بنصف او ثلث اوربع -

"রাসূলুল্লাহ (সা) মুখাবারা নিষিদ্ধ করেছেন। সাবেত বিন হাজ্জাজ হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে জিজ্ঞেস করলেন, মুখাবারার অর্থ কি? হযরত যায়েদ (রা) জবাব দিলেন; এর অর্থ হলো উৎপাদনের অর্ধেক অথবা এক–তৃতীয়াংশ অথবা এক–চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে চাষাবাদের জন্য জমি নওয়া" (আবু দাউদ)

এসব হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা

উপরে আমরা সেই সমস্ত হাদীস অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত করেছি যার ভিত্তিতে ইসলামে জমির ভাগচাষ ও নগদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং স্বয়ং মালিকের চাষাবাদ করা অথবা বিনিময় ছাড়াই অপর কাউকে জমি চাষাবাদ করতে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস সম্ভবত আমি ছেড়ে দেইনি। এখন আসুন, আমরা এর উপর একটু পর্যালোচনামূলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে চেষ্টা করি যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি তা–ই যা এই অসংখ্য হাদীস থেকে প্রকাশ পায়?

প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কেবলমাত্র একজন মুফতী ও শিক্ষকই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন শাসকও এবং কার্যত গোটা প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল তাঁরই হাতে।

প্রত্যেকের এ কথাও জানা আছে যে, ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপার দু, চার, পাঁচ, দশজন লোকের প্রাইভেট ও ব্যক্তিগত জীবনের কোন আকস্মিক বিতর্কিত ব্যাপার ছিল না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কানে কানে চুপিসারে বলে দেয়া যেতো। এ ব্যাপারটা তো গোটা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। যার মাধ্যমে লাখো মানুষের জীবন–জীবিকা স্বভাবতই প্রভাবিত হয়। তাই এ

ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সা) যে নীতিমালাই অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর যুগে ও তাঁর খলীফাদের যুগে একটা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সাধারণ ব্যাপার হওয়া উচিত ছিল।

অতপর যারা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর সীরাত, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে কিছুমাত্রও অবগত আছেন তারা এ ধারণা পর্যন্ত করতে পারেন না যে, (আল্লাহ মাফ করুন), রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সব লোকের মত ছিলেন যারা মুখে একটা জিনিসকে ভুল বলে, অথচ তা প্রচলিত থাকতে দেয় এবং মুখে অন্য একটি পদ্ধতিকে সঠিক বলে অথচ বাস্তবে তা কার্যকর করে না। অথবা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পদ্ধতিকে বন্ধ করে অন্য একটি পদ্ধতি কার্যকর করতে চান আর সাহাবায়ে কেরাম (রা) তা মানছেন না। অথবা খোলাফায়ে রাশেদীন অবহিত হয়ে থাকবেন যে, রাসূলে করীম (সা) একটি প্রথার বিলোপ সাধন করে আর একটা সংস্কারমূলক পদ্ধতি কার্যকর করতে চাচ্ছিলেন এবং এরপরও তাঁরা তাঁদের গোটা খিলাফতকালে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর এ পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা হতে বিরত থেকেছেন।

এ তিনটি ব্যাপার এতটা প্রকাশ্য ও খোলামেলা যে, তা কোন বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন আপনি যদি শুনেন যে, নবী করীম (সা)–এর যুগ থেকে শুরু করে আমীরে মুয়াবিয়া (রা)–এর খিলাফতের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত উপরে উল্লেখিত পাঁচ ছয় জন সাহাবী ছাড়া আর কারও জানা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ভাগচাষে এবং নগদ বিক্রিতে জমি চাষাবাদ করতে দিতে নিষেধ করেছেন অথচ স্বয়ং রাসূলুলাহ (সা) এবং তাঁর সকল প্রবীণ সাহাবী এবং তাঁর সাথে যথাযথ সম্পর্ক রাখে এমন বড় বড় পরিবার ভাগচাষে জমি দিতে থাকেন, আরও এই যে, খোলাফায়ে রাশেদার গোটা শাসনামলে এ প্রথা অব্যাহত ছিল, তাহলে আপনারা কি হতবাক হবেন না? প্রকৃতপক্ষে এ হলো একটা নেহায়েত অনভিপ্রেত কথা। কিন্তু আসল ব্যাপার তাই। আমরা এখানে সেই সব রিওয়ায়াত ক্রমিক নম্বর দিয়ে পেশ করছি, যা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) নাফে (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) রাসূলে করীম (সা)–এর যুগে এবং তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমার (রা) ও উসমান (রা)–এর যুগে অনবরত ভাড়ায় নিজের জমি চাষাবাদ করতে দিতে থাকেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রা)–এর শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়েও এ পদ্ধতি চালু ছিল। এমন কি আমীরে মুয়াবিয়া (রা)–এর খিলাফতের শেষ প্রান্তে (অর্থাৎ অনুমান ৫০ হিজরী অথবা এর পরের যুগ) তিনি জানতে পারলেন যে, রাফে' বিন খাদীজ (রা) নবী করীম (সা) থেকে এ কাজের নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে তিনি রাফে' (রা) বিন খাদীজ (রা)–এর সাথে দেখা করতে গেলেন এবং আমি (বর্ণনাকারী) তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি ধরনের রিওয়ায়াত যা আপনি বর্ণনা করছেন? রাফে' (রা) উত্তরে বললেন, রাসূলুলাহ (সা) ভাড়ায় জমি খাটাতে নিষেধ করতেন। এরপর থেকে ইবনে উমার (রা) ভাড়ায় জমি চাষাবাদ করতে দেয়া বন্ধ করে দেন। আর যখনই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো—তিনি জবাব দিতেন, রাফে' (রা) বিন খাদীজ (রা)–এর দাবী এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কাজ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

এ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীস স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন উমার (রা)–এর পুত্র হযরত সালেম (রা)–ও বর্ণনা করেছেন। তার ভাষা হলো—হযরত আবদুল্লাহ (রা)–এর প্রশ্নের উত্তরে রাফে' (রা) বলেছেন, আমি আমার দু'জন চাচাকে (যাঁরা বদরী সাহাবী ছিলেন) পরিবারের লোকজনের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (সা) কেরায়ায় (ভাড়ায়) চাষাবাদে দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন :

لقد كنت اعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى –

"আমি নিশ্চিত জানি যে, রাসূলে করীম (সা)–এর যামানায় জমি কেরায়ার ভিত্তিতে দেয়া হত।"

কিন্তু রাসূলে করীম (সা) এ কাজ নিষিদ্ধ করেছেন আর তা তিনি অবহিত হতে পারেননি এ ভয়ে হযরত আবদুল্লাহ কেরায়ায় জমি চাষাবাদ করতে দেয়া বন্ধ করে দেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এমন ব্যক্তি যাঁর সহোদরা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর স্ত্রী ছিলেন, যাঁর পিতা হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা)–এর পরম নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা ছিলেন। আবার স্বয়ং দশ বছর পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন। গোটা নবুয়তের কাল ও খিলাফতে রাশেদার গোটা যুগে ভূমির ব্যাপারে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকা কি তাঁর মত ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্ভব? আর এটাও কি সম্ভব ছিল যে, হযরত উমার (রা)–এর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র স্বয়ং তাঁর তরফ থেকে তাঁর পরিবারের জায়গা–জমির ব্যবস্থাপনা এমন পদ্ধতিতে করতে থাকবেন– যা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ ছিল।[১]

১.এখানে প্রশ্ন করা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) যদি ভাগচাষ ও ভাড়ায় জমি দেয়া জায়েয হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন তাহলে আবার রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর বর্ণনা শুনে এ পদ্ধতি কেন ত্যাগ করলেন? বাহ্যত ব্যাপারটি সন্দেহে ফেলে দেবার মত। কিন্তু যে ব্যক্তি হযরত ইবনে উমার (রা)–এর চরিত্র ও মেজায সম্পর্কে অবহিত তিনি এমন ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিপতিত হবেন না। ব্যাপার হলো, সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে ইবনে উমার (রা)–এর স্বভাব চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমা অতিক্রম করে কঠিন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো। শেষ জীবনে তো তিনি এক পর্যায়ে 'ওয়াহামের' রূপ ধারণ করে বসেছিলেন। যেমন– উযূতে তিনি এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তিনি চোখের ভিতরের অংশও ধুয়ে নিতেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত এ কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে লাগলো। নিজের সন্তানদের চুমু খেলে কুলি করা ছাড়া নামায পড়তেন না। নামাযের সময় যদি ইমামের সাথে পরে এসে জামায়াতে শরীক হতেন তাহলে নামাযের শেষে শুধু ছুটে যাওয়া নামাযই আদায় করতেন না, বরং 'সুহু সিজদাও' করতেন। (বিস্তারিত জানার জন্য যাদুল মাআদ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬ দেখুন)। এত কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তিনি যদি রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর বর্ণনা শুনে নিজের জমি কেরায়ায় দেয়া বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে এটা মনে করা উচিত নয় যে, তিনি যে গোটা নবুয়তের কালে ও খিলাফতের সময়সহ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জমি ভাগ চাষ ও কেরায়া দিয়ে আসছিলেন এবং যে কাজ তিনি বড় বড় সাহাবী, খোলাফায়ে রাশেদীন এমন কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)–কে করতে দেখেছেন তার বৈধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন? যদি তাঁর মনে ভাগচাষের বৈধতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ জাগতো তাহলে তাঁর মুখ থেকে এ অভিযোগসূলভ বাক্য কিভাবে বের হতো। (যেমন মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় আছে) যে, لقد منعنا رافع نفع ارضنا "রাফে' (রা) আমাদেরকে আমাদের ভূমির লাভ থেকে বঞ্চিত করেছেন।"

ইবনে উমার (রা) যদি কোন পর্যায়েও জানতেন যে, এটা রাসূলে পাক (সা)–এর হুকুম তাহলে তাঁর মুখ থেকে এমন অভিযোগপূর্ণ বাক্য কি কেউ আশা করতে পারেন?

(২) ইবনে উমার (রা)–এর এই বর্ণনা এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) ও আনাস বিন মালিক (রা)–এর বর্ণনা এর সত্যতা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা) খায়বার এলাকা আক্রমণ করলেন। এর কিছু অংশ সন্ধি সূত্রে বিজিত হয়েছে এবং কিছু অংশ বিজিত হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে। রাসূলে করীম (সা) এর অর্ধেক অংশ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের জন্য রেখে দিলেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক এলাকা ১৮শত ভাগে বিভক্ত করে তা খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পনরশত সৈন্যের মধ্যে বন্টন করে দিলেন (অর্থাৎ ১২শ পদাতিক সৈনিককে এক ভাগ করে আর তিনশ' অশ্বারোহীকে দুই ভাগ করে দেন)। অতপর তিনি বিজিত এলাকা থেকে ইয়াহূদীদের বহিষ্কারের মনস্থ করলেন। কিন্তু ইয়াহূদীরা এসে আবেদন জানালো যে, "আপনি আমাদেরকে এখানে থাকতে দিন আমরা আপনার তরফ থেকে এখানে চাষাবাদ করবো। অর্ধেক ফসল আপনি নিয়ে নিবেন, আর বাকী অর্ধেক নেবো আমরা।" নিজের কাছে শ্রমিকের স্বল্পতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তাদের বলে দিলেন—যতদিন আমার ইচ্ছা, তোমাদেরকে এখানে থাকতে দেব এবং যখন ইচ্ছা তোমাদেরকে এখান থেকে উচ্ছেদ করব। অতএব এসব শর্তের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে ব্যাপারটি মীমাংসা করে নেন। তারা কৃষক হিসেবে খায়বারে চাষাবাদ করছিলো। অর্ধেক জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র এবং বাকী অর্ধেকের মালিক ছিল পনরশত সৈনিক যাদেরকে আঠারশ খণ্ড জমি বন্টন করে দেয়া হয়েছিল। ভাগচাষের চুক্তি মোতাবেক যে অর্ধেক ফসল সেখান থেকে আসতো তা রাষ্ট্র ও অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। রাসূলে করীম (সা)–এর নিজের অংশও এ সাধারণ অংশীদারদের সাথে ছিল। সুতরাং তিনি এখান থেকে প্রাপ্ত প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট অংশের শস্য ও খেজুর নিজের স্ত্রীদের মধ্যে বরাবর বন্টন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর শেষ জীবন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। হযরত আবু বকর (রা)–ও তাঁর খিলাফতকালে এই নিয়ম অনুসরণ করেন। হযরত উমার (রা)–এর খেলাফতের প্রাথমিক পর্যায়েও এ নিয়ম কার্যকর ছিল। কিন্তু খায়বারে ইয়াহূদীদের চক্রান্ত একের পর এক বৃদ্ধি পেতে থাকলে হযরত উমার (রা) চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার এবং যার যার অংশ নিজ নিজ দখলে নেওয়ার ঘোষণা দিলেন। মহানবী (সা)–এর পবিত্র স্ত্রীদের

সামনে হযরত উমার (রা) এ প্রস্তাব পেশ করলেন যে, আপনাদের যার ইচ্ছা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যে পরিমাণ শস্য ও ফল পেতেন ততটুকু জমি নিয়ে নিতে পারেন। আর যার খুশী নিজের অংশের ভূমি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় থাকতে দিতে পারেন। তারা এ পরিমাণ ফসল সরকারের নিকট থেকে নিতে থাকবেন। এ প্রস্তাব অনুযায়ী রাসূলে পাক (সা)-এর কোন কোন সম্মানিতা স্ত্রী ফসল নেয়া পসন্দ করলেন আর কেউ [হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা)] জমি নিয়ে নিলেন।[১] এরপর হরত উমার (রা) ইয়াহূদীদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করে 'তায়মা' ও 'আরিহা' এলাকায় পুনর্বাসন করেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

এটা নবুয়ত যুগের ও খিলাফতে রাশেদার আমলের বিখ্যাত ঘটনাসমূহের অন্তর্ভূক্ত এবং যথার্থতার ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, স্বয়ং নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এবং খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পনরশত সৈনিকের তরফ থেকেও ভাগচাষের শর্তে জমি চাষাবাদের জন্য দিয়েছেন। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) ও উমার (রা) এ পদ্ধতি চালু রেখেছেন। এরপরও কি কেউ ধারণা করতে পারে যে, জমি ভাগচাষে দেয়া ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ ছিল?

এর জবাবে যারা বলেন, খায়বারের ব্যাপারটা ভাগচাষের ছিল না, বরং তা ছিল 'খারাজের' ব্যাপার—তাদের কথা সঠিক নয়। খায়বারের জমির যে অর্ধেকের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয় তা ভাগচাষে দেয়ার অর্থ তো অবশ্যই খারাজ ছিল। কিন্তু মুজাহিদদের মধ্যে বন্টনকৃত বাকী অর্ধেক জমির ভাগচাষকে কিভাবে 'খারাজ' নাম দেয়া যেতে পারে?

---

১. প্রকাশ থাকে যে, মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে যে জমি ভাগ করে দেয়া হয়েছিল তা তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল না, বরং যেহেতু হযূরের পবিত্রা স্ত্রীগণকে উম্মতের 'মা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং রাসূলের ইন্তেকালের পরে আল্লাহ তাঁদের কোথাও 'বৈবাহিক' জীবনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের জীবন-জীবিকার দায়িত্ব পালন করা উম্মতের উপর ছিল ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে যেসব লোক বলে, "খায়বারের ইয়াহূদীরা রীতিমত যিম্মী প্রজা ছিল না, কেননা, তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়নি, তাই তাদের নিকট থেকে যা ইচ্ছা তা-ই আদায় করার অধিকার মুসলমানদের ছিল।" তাদের এ দাবীও সঠিক নয়। সকলেরই জানা আছে যে, কুরআন মজীদে জিযিয়ার বিধান খায়বারের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়নি। আচ্ছা। জিযিয়ার বিধানের অবর্তমানে কি করে "জিযিয়া আরোপ না করার" উপর কোন আইনগত প্রমাণের ভিত্তি রাখা যায়? খায়বারবাসীদের যিম্মী হওয়া তো এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী হুকূমাত যথারীতি একটি চুক্তির ভিত্তিতে খায়বারবাসীদেরকে নিজেদের এলাকায় বসবাস করতে দিয়ে, তাদের উপর খারাজ (কর) আরোপ করেছে এবং তাদের উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধান ঠিক সেভাবে আরোপ করেছে যেভাবে মুসলিম প্রজাদের উপর কার্যকর করেছিল। আবু দাউদের একটি বর্ণনায় আছে, খায়বারের চুক্তিপত্র সম্পন্ন হবার পর মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের আবাসিক এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান ইয়াহূদীদের উপর বাড়াবাড়ি করে বসল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ অভিযোগ এলে তিনি একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন, "আহলে কিতাবের বাড়িতে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করে তাদের ছেলে-মেয়েদের মারপিট করা, গাছের ফল খেয়ে ফেলা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য হালাল করেননি। তাদের উপর যা ওয়াজিব ছিল তা তারা তোমাদের দিয়ে দিয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ভাষণ কি খায়বারবাসীদের যিম্মী হবার সুস্পষ্ট দলীল নয়? ইসলামের ফৌজদারী আইনে কাসামতের[১] নীতির উৎসই হলো খায়বারে একজন মুসলমানকে গুপ্ত হত্যার ঘটনা। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আইনের চোখে মুসলমান ও ইয়াহূদী সবাই ছিল এক সমান। যদি বলা হয় যে, কথা যদি তাই হয়, তাহলে জিযিয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের উপর কেন জিযিয়া আরোপ করা হলো না? এর উত্তর হলো, সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়ার আগে

---

১ কাসামাত-কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী যদি সনাক্ত করা না যায় এবং একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেও মনে না হয়, বরং নিহতের মধ্যে খুন হবার আলামত পাওয়া যায় তাহলে যে এলাকায় খুনের ঘটনা ঘটেছে সে এলাকাবাসীদের কোর্টের সামনে সম্মিলিতভাবে শপথ করাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় "কাসামাহ" বলা হয়—(অনুবাদক)

যাদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল তার সাথে একটি নতুন শর্ত যোগ করা কিভাবে জায়েয ছিল? এরপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তারা যখন যিম্মীই ছিল তখন খায়বার হতে তাদের উচ্ছেদ করা হলো কেন? এর জবাব হলো, তাদেরকে যিম্মীতে পরিণত করার সময় যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তদনুযায়ী খায়বার থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। অনন্তর এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত উমার (রা) তাদেরকে হিজায থেকে বের করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের সীমা থেকে নয়। তিনি রাষ্ট্রের এক অংশ থেকে তাদেরকে স্থানান্তর করে আর এক অংশে (তায়মা ও আরীহায়) পুনর্বাসন করেছিলেন।[১] এরপর যারা বলেন, এটা বর্গা চাষের ব্যাপার ছিল না, কেননা এতে সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না, তাদের এ কথাও সঠিক নয়। তাদের সাথে রাসূলে করীম (সা)-এর সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহের একটি ছিল " نقركم بها على ذالك ما شئنا এ চুক্তি অনুযায়ী যতদিন ইচ্ছা আমরা তোমাদেরকে এখানে থাকতে দিব।" এখানে সময়সীমা নির্ধারণ, সময়ের হিসেবে নয় বরং মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর তা ছিল একটা বিশেষ অবস্থার কারণে—যার মধ্য দিয়ে ইয়াহূদীদের সাথে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়েছিল। এতটুকুন কথার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে, খায়বারের ঘটনা আদতেই বর্গাচাষের ব্যাপার ছিল না। অথচ অন্যান্য বর্ণনায় খায়বারের ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে বর্গাচাষের ব্যাপার হিসেবেই দৃষ্টিগোচর হয়।[২]

---

১ এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা ইবনুল কাইয়েমের যাদুল মায়াদ, ২য় খণ্ডের, ৯, ১০৮, ১১১, ২০১, ২০৬ পৃঃ দেখুন।

২. প্রকাশ, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ভাগে চাষাবাদের জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। লিসানুল হোকামে আছে وفى النوازل عن محمد بن سلمة المزارعة من غير بيان المدة جائزة ايضا صفح ١٩٥ "সময়সীমা উল্লেখ না করেও ভাগচাষ জায়েয" (পৃঃ ১৯৫)। এবং আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরাবাআহ নামক গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

ويصح عقد المزارعة بدون بيان المدة اذا كان وقت الزرع معروفا - جلد صفح

"ফসলের সময়কাল সর্বজন পরিচিত হ'লে সময়সীমা নির্দ্ধারণ ব্যতিতও ভাগে চাষাবাদ জায়েয।" ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে একটি বর্ণনা আছে এবং স্মরণ থাকে যে, তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁর সূত্রে ভাগচাষের নিষিদ্ধতা এবং নিজে চাষাবাদ করার অথবা বিনামূল্যে অন্যকে চাষাবাদ করতে দেয়ার উপদেশবাণী বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) মদীনায় আগমন করার পর আনসারগণ এসে আরয করলেন ঃ

اقسم بيننا وبين اخواننا النخل –

"আপনি আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে খেজুরের বাগানগুলো বন্টন করে দিন।"

কিন্তু নবী করীম (সা) এভাবে বন্টন করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এরপর আনসারগণ মুহাজিরদের বললেন ঃ

تكفرنا العمل نشركم فى الثمرة –

"আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে খেজুরের বাগানসমূহে কাজ করুন এবং আমরা আপনাদেরকে ফসলে অংশ দিব।"

মুহাজিরগণ তখন বললেন ঃ سمعنا واطعنا

"আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করলাম"। (বুখারী)।

(৪) কায়েস বিন মুসলিম হযরত আবু জাফর (র) (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে) বর্ণনা করেছেন, মদীনায় মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না যারা এক–তৃতীয়াংশ বা এক–চতুর্থাংশ উৎপাদনের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করেনি। এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারী (র) এর সমর্থনে আরো দৃষ্টান্ত পেশ করে লিখেছেন যে, হযরত আলী (রা) বর্গা বা ভাগচাষ করেছেন, আরো করেছেন সা'দ বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, উমার বিন আবদুল আযীয এবং কাসেম ও ওরওয়াহ।[১] হযরত আবু বকর (রা)–এর পরিবার, আলী (রা)–এর পরিবার, উমার (রা)–এর পরিবার[২]

---

১. কাসেম বিন আবু বকরের হাদীস পুরো সনদের সাথে আবদুর রাজ্জাক আর বাকী পাঁচজন বুযুর্গের হাদীস সনদের সাথে ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন।

২. এ তিন পরিবারের বর্গা চাষের রীতি প্রচলিত হবার গোটা সনদ আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন।

সকলেই বর্গায় চাষাবাদ করায়েছেন। হযরত উমার (রা) তো মানুষের সাথে ব্যাপারটা এমনভাবে সম্পাদন করতেন যে, যদি হযরত উমার (রা) নিজে বীজ দিতেন তাহলে অর্ধেক ফসল নিতেন। আর যদি বর্গাচাষী নিজে বীজ দিতেন তাহলে উমার (রা)–এর এত অংশ হতো (বুখারী, বাবুল মুযারাআত বিশ শাতরি ওয়া নাহবিহি)।[১]

(৫) হযরত আবু জাফর (র) (ইমাম মুহাম্মাদ বাকের) আর একটি বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা করেছেন :

كان ابو بكر يعطى الارض على الشطر (طحاوى)

"হযরত আবু বকর (রা) তাঁর জমি আধা ভাগে চাষ করাতেন।" (তাহাবী)

(৬) ইবনে আবু শায়বা হযরত আলী (রা)–এর কথা বর্ণনা করেছেন :

لا بأس المزارعة بالنصف –

"আধাভাগে জমি চাষাবাদ করা দোষণীয় নয়।" (কানজুল উম্মাল)

(৭) তাউস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, মুয়ায বিন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে এবং তার পরে হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং এর পরে হযরত উমার (রা) ও হযরত উসমানের (রা) যুগে উৎপাদনের এক–তৃতীয়াংশ ও এক–চুতুর্থাংশ ভাগে নিজে জমি চাষাবাদ করাতেন। (ইবনে মাজাহ)। এ হাদীসে ভুল শুধু এতটুকু যে, তাউস হযরত উসমানের যুগেরও উল্লেখ করে ফেলেছেন। অথচ মুয়ায বিন জাবাল হযরত উমারের যুগেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু শুধু এতটুকু ভুলের জন্য তাউসের মত ব্যক্তিত্বের গোটা রিওয়ায়াত ভুল বলা যায় না।[২] বিশেষ করে তাঁর রিওয়ায়েতের

---

১. ইবনে আবু শায়বা এবং বায়হাকী হযরত উমার (রা)–এর এ কাজ পুরো সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

২. তাউসের ব্যাপারে সাধারণত মুহাদ্দিসগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, হযরত মুআবের ব্যাপারে তিনি খুব বেশী জানতেন। তাঁর ব্যাপারে এ রিওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য। যদিও তাঁর সাথে তাঁর দেখা হয়নি। ইমাম শাফিঈ লিখেছেন :

طاوس عالم بامر معاذ ان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن ادرك معاذا –

ইবনে হাজার এ কথা বর্ণনা করার পর এর সাথে আরো লিখেছেন,

وهذا مما لا اعلم من احد فيه خلافا

সনদে যখন সব রাবীই সিকা (নির্ভরযোগ্য)। এখন ভাবতে হবে যে, হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) হলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং ইয়েমেনের প্রধান বিচারপতি এবং যাকাত ব্যবস্থার প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اعلمهم بالحلال والحرام

"হালাল–হারাম সম্পর্কে সে সকলের চেয়ে বেশী অবহিত।" আর যাঁকে হযরত উমার (রা) আবু উবায়দা (রা)–এর পরে গোটা সিরিয়ার সামরিক গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন এমন লোকও ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা কি ছিলো তা জানতেন না এ কথা কি চিন্তা করা যায়?

(৮) মূসা বিন তালহার বর্ণনা। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), আম্মার (রা) বিন ইয়াসির, খাব্বাব বিন আরাত এবং সায়াদ বিন মালেক (রা)–কে হযরত উসমান (রা) জমি দান করেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত সাআদ বিন মালিক তাদের প্রাপ্ত জমির উৎপাদিত ফসলের এক–তৃতীয়াংশ ও এক–চুতুর্থাংশের বিনিময়ে বর্গা চাষাবাদ করাতেন।

(কিতাবুল খারাজ–ইমাম আবু ইউসুফ)

এসব দলীল ও দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের কালে ও খিলাফতে রাশেদার আমলে বর্গা প্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং নবী করীম (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সকল কৃষিজীবী সাহাবাদের পরিবারে বর্গা প্রথা চালু ছিল। রাফে' বিন খাদীজ (রা) প্রমুখ সাহাবাদের এ ধরনের রিওয়ায়েত প্রচার হওয়ার আগে গোটা পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে কারো এ কথা আদৌ জানা ছিল না যে, এ ব্যাপারে কোন প্রকার নেতিবাচক বিধান বিদ্যমান আছে।

তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা

ব্যাপারটি এখন কিছুটা ভিন্ন দিক থেকেও দেখুন। ইসলামের বিধানসমূহ পরস্পর বিপরীত বা পরস্পর সংঘর্ষশীল নয়। তার হেদোয়াত ও

আইন–কানুনের প্রতিটি জিনিস তার সার্বিক ব্যবস্থার সাথে এমন সুসামঞ্জস্যশীল যে, অপরাপর আইন–কানুনের সাথে তার জোড় খাপ খেয়ে যায়। এটা হলো এমন এক সৌন্দর্য—যাকে আল্লাহ তায়ালা এ দীন যে, তাঁরই তরফ থেকে আসা তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমরা যদি মেনে নেই যে, শরীয়াতে ভাগচাষ নাজায়েয, এবং শরীয়াত প্রণয়নকারী জমির মালিকানাকে নিজে চাষাবাদ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চান এবং শরীয়াত প্রণয়নকারী মানুষকে নিজের কাছে বিদ্যমান চাষাবাদের অতিরিক্ত জমি হয় কাউকে বিনামূল্যে দিয়ে দিবে অথবা বেকার ফেলে রাখবে তবে সামান্য চিন্তা করলে আমাদের প্রকাশ্যেই অনুভূত হতে থাকে যে, এ হুকুম ইসলামের অন্যান্য মূলনীতি ও আইন–কানুনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এবং এটাকে ইসলামী ব্যবস্থায় ঠিকভাবে স্থাপনের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন আনয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈপরীত্বের কিছু স্পষ্ট নমুনা দেখুন।

(১) ইসলামী ব্যবস্থায় মালিকানার অধিকার শুধুমাত্র শক্তিমান পুরুষদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, নারী, শিশু, রুগ্ন এবং বৃদ্ধরাও এ অধিকার প্রাপ্ত হয়। ভাগ চাষ যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে তাদের সকলের জন্য কৃষি মালিকানা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(২) ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের আলোকে যেভাবে একজন মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্পদ অনেক লোকের মধ্যে বন্টিত হয়, ঠিক সেভাবে কোন কোন সময় অনেক মৃত ব্যক্তির সম্পদও এক ব্যক্তির নিকট জমা হয়ে যেতে পারে। এখন এটা কত আশ্চর্যের কথা যে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইনতো শত সহস্র একর জমি পর্যন্ত এক ব্যক্তির নিকট গুটিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু তার কৃষি আইন তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ছাড়া বাকী সব জমির মালিকানা হতে লাভবান হওয়াকে হারাম করে দেয়।

(৩) ক্রয়–বিক্রয়ের ইসলামী আইন যে কোন ধরনের বৈধ জিনিসের ক্ষেত্রেও মানুষের উপর এরূপ বিধি–নিষেধ আরোপ করেনি যে, সে সর্বাধিক একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই তা খরিদ করতে পারবে এবং এই সীমার বেশী

খরিদ করার তার কোন অধিকার নাই। বেচা-কেনার এই সীমাহীন অধিকার মানুষের যেমন সকল বৈধ জিনিসের ব্যাপারে আছে—তেমনি জমির ব্যাপারেও সে অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু এ কথা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয় যে, দেওয়ানী আইন অনুযায়ী এক ব্যক্তি তো তার ইচ্ছামত পরিমাণ জমি ক্রয় করতে পারবে, কিন্তু কৃষি আইনানুযায়ী সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী ভূমির মালিকানার ফল ভোগ করার অধিকার পাবে না।

(৪) ইসলাম কোন প্রকার মালিকানার উপরই পরিমাপ ও পরিমাণগত দিক থেকে কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। বৈধ উপায়ে বৈধ জিনিসের মালিকানার যখন তার সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হতে থাকে তখন তা সীমাতিরিক্ত রাখা যায়। টাকা-পয়সা, জীব-জন্তু, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বাড়ীঘর, যানবাহন মোট কথা কোন জিনিসের ব্যাপারেই আইনত মালিকানার পরিমাণের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তাহলে শেষ পর্যন্ত শুধু কৃষি সম্পদের এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে যার কারণে এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে শরীয়াতের মনোভাব হবে ব্যক্তির মালিকানাকে পরিমাণের দিক থেকে সীমিত করা, অথবা লাভবান হওয়ার সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ সীমার অধিক মালিকানাকে ব্যক্তির জন্য অকেজো করে দেয়া।[১]

(৫) জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম দয়ামায়া ও দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু অত্যাবশকীয় হক আদায় করার পর আর কোন ব্যাপারেই আমরা দেখি না যে, ইসলাম ইহসান ও দানশীলতাকে মানুষের উপর অবশ্যকরণীয় করেছে। উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করে তাকে ইসলাম তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সা গরীব-দুঃখীদের দান করার জন্য উৎসাহিত করে কিন্তু সে এই দান-খয়রাতকে তার উপর ফরয করে না এবং এ কথাও বলে না যে, অভাবীদের ঋণ হিসেবে অথবা মুজারাবাতের

---

১. এখানে ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামের মৌলিক বিধান তো তাই যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি। অবশ্য কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে সেই অবস্থা বিরাজমান থাকা পর্যন্ত সাময়িকভাবে তা করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তের কারণে ইসলামের মৌল বিধানে কোন স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে না। সামনে অগ্রসর হয়ে এ বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

নীতিতে টাকা–পয়সা দিয়ে তার ব্যবসায়ে শরীক হওয়া হারাম, বরং দান শুধু দানের আকারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে যেমন কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'বাড়ী' থাকলে অথবা এমন একটি বড় বাড়ী থাকলে যাতে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা আছে এ ধরনের অতিরিক্ত বাড়ী ও বাড়ীর অতিরিক্ত জায়গা, যাদের বাড়ীঘর নেই তাদেরকে নিস্বার্থভাবে ব্যবহার করতে দেয়াকে ইসলাম খুবই উৎসাহিত করে। কিন্তু অনিবার্যভাবেই তা বিনামূল্যে দিয়ে দিতে হবে এবং বাড়ীভাড়া দেয়া হারাম এমন কথা ইসলাম বলেনি। তদ্রূপ অতিরিক্ত কাপড়–চোপড়, থালা–বাসন, যানবাহন ইত্যাদির ব্যাপারেও একই কথা। এসব জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দানশীলতার মনোভাব নিয়ে নিস্বার্থভাবে দিয়ে দেয়াকে অবশ্যই পসন্দ করা হয়েছে, কিন্তু তা ফরয করে দেয়া এবং বিক্রি করা ও ভাড়ায় দেয়া হারাম করা হয়নি। এখন কৃষিজাত জমির ব্যাপারে এমন কি ঘটলো যার কারণে এ ব্যাপারে ইসলাম তার এই সাধারণ মৌল নীতিকে পরিহার করে এর উৎপাদনের উপর যাকাত আদায় করার পরও তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অবশ্যম্ভাবী রূপে অপরকে বিনামূল্যে দিয়ে দিতে বাধ্য করবে এবং অংশিদারীত্বের অথবা মুজারাবাতের নীতিমালা অনুযায়ী কোন কারবার অবশ্যই করবে না।

(৬) ইসলামী আইন ব্যবসা–বাণিজ্য, শিল্প–কারখানা ও অর্থনৈতিক কারবারের প্রতিটি বিভাগে মানুষকে অবাধ অনুমতি দিয়েছে যে, সে লাভ–লোকসানের অংশীদারীত্বের নীতি অনুযায়ী অপরের সাথে কাজ –কারবার করতে পারবে। এক ব্যক্তি অন্যকে নিজের টাকা–পয়সা দিয়ে ঠিক করে নিতে পারে যে, তুমি এই টাকা দিয়ে কারবার করবে। যদি লাভ হয়, তাহলে এর অর্ধেক অথবা এক– চতুর্থাংশের মালিক আমি হবো। এক ব্যক্তি কাউকে নিজের পুঁজি কোন দালানকোঠা রূপে, কিংবা কোন মেশিন কি ইঞ্জিন হিসেবে, কোন মটর অথবা নৌকা বা জাহাজরূপেও দিয়ে দিতে পারে এবং বলতে পারে যে, তুমি এগুলো কাজে লাগাও। এতে যা লাভ হবে তার এত অংশ আমাকে দিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের পুঁজি জমির আকারে অন্যকে দিয়ে এমন কোন সংগত কারণে বলতে পরবে না যে, এতে যে ফসল

উৎপন্ন হবে তার এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক অংশের মালিক আমি।

এই কয়েকটি মাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মানুষ এক নজরে দেখতে পারে যে, এ বর্গা চাষাবাদের নিষিদ্ধতা এবং এ স্বয়ং চাষাবাদের শর্তারোপ এবং জমির মালিকানার জন্য সীমা নির্ধারণ ইসলামের সামগ্রীক ব্যবস্থায় কোনভাবেই খাপ খায় না। যদি একে খাপ খাওয়াতে হয় তাহলে অন্যান্য অনেক নীতিমালা ও আইনের পরিবর্তন করতে হবে। অন্যান্য নীতিমালা ও আইন যদি স্ব স্ব স্থানে ঠিক থাকে তাহলে এগুলোর সাথে প্রতি পদে পদে এর সংঘর্ষ বাধতে থাকবে।

নেতিবাচক বিধানের আসল তাৎপর্য

উপরে উল্লেখিত হাদীস ভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এসব যুক্তির ভিত্তিতে কি এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, এতজন সাহাবী সূত্রে অসংখ্য সিকা (নির্ভরযোগ্য) রাবী সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসসমূহ কি ভুল? না, আসল কথা তা নয় যে —এসব হাদীস মনগড়া অথবা দুর্বল। প্রকৃত তাৎপর্য শুধু এই যে, এতে কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে যার ফলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং হযরত রাফে' বিন খাদীজ, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের অন্যান্য রিওয়ায়াত যখন আমাদের সামনে আসে এবং অপরাপর প্রবীণ সাহাবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন আমরা দেখি তখন পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন একভাবে আর রিওয়ায়াত হয়েছে অন্যভাবে।

হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর বিশ্লেষণ

আমি বলে এসেছি যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজত্বকালের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সব ইসলামী দেশে সাধারণভাবে সকলেই ভাগচাষ ও জমি ভাড়া-ক্রয়ের কারবার করতো এবং শরীয়াতের দিক থেকে এতে কোন দোষ আছে বলে কারো ধারণাও ছিল না। তাই হিজরী পঞ্চাশ সালের কাছাকাছি সময়ে হঠাৎ করে যখন এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, কতিপয়

সাহাবী এ বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হুকুম রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন তখন চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। লোকেরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করতে বাধ্য হলো যে, বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ (সা) এ হুকুম দিয়েছেন কিনা, কি অবস্থায় দিয়েছেন এবং কোন্ জিনিসের ব্যাপারে দিয়েছেন? এ ব্যাপারে তারা ওই সব সাহাবীদের নিকটও জিজ্ঞাসা করেছেন যারা ভাগচাষ ও জমি কেরায়া দেরার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হুকুম বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবীকেও জিজ্ঞাসা করেছেন। এ ধরনের জিজ্ঞাসা ও আলোচনার মাধ্যমে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা সেই সব সম্মানিত রাবীগণের ভাষায়ই আমি নীচে বর্ণনা করছি।

হানযালা বিন কায়েস (র) বলেন, আমি হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)–কে সোনা ও রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া (নগদ ভাড়া) দেবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি যে, তা কেমন? তিনি বললেন, না কোন দোষ নেই। এরপর তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ

انما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذ يانات واقبال الجد اول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا او يسلم هذا او يهلك هذا - فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذا لك زجرعنه - واما شىء معلوم مضمون فلا باس به (مسلم - ابو داود - نسائى)

"আসল কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে মানুষ নিজ নিজ জমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেবার সময় ফায়সালা করে নিত যে, পানির নালার মুখের ও এর কাছের এবং জমির বিশেষ বিশেষ অংশে যে ফসল উৎপাদিত হবে তা মালিক নিয়ে নিবে। এ অবস্থায় কোন কোন সময় এমন হত যে, এক জায়গার ফসল হয়তো নষ্ট হয়ে যেতো এবং অন্য জায়গার ফসল রক্ষা পেতো। আবার কখনও এক জায়গার ফসল বেঁচে যেতো এবং অন্য জায়গার ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। সেকালে

জমি কেরায়া দেবার এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) কঠোরভাবে এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছেন। এখন উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অংশের ক্ষেত্রে উক্তরূপ চুক্তি করায় কোন দোষ নেই।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

হানযালা বিন কায়েসের অন্য বর্ণনায় হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর ভাষ্য হলো ঃ

كنا نكرى الارض بالناحيه منها مسمى لسيد الارض قال فمهما يصاب ذالك وتسلم الارض ومهما يصاب الارض ويسلم ذالك - فنهينا - واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

"আমরা জমি এভাবে কেরায়ায় লাগাতাম যে, জমির একটি নির্দিষ্ট অংশের উৎপাদন মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতো। ফলে কোন কোন সময় এমন হতো যে, ঐ অংশের সব ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যেতো এবং অবশিষ্ট অংশ ঠিক থাকতো। আবার কোন কোন সময় ঐ অংশ বেঁচে যেতো আর অন্য অংশের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যেতো। এ কারণে এ পদ্ধতিতে আমাদেরকে কারবার করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর সে সময় সোনা রূপার বিনিময়ে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলনই ছিল না।" (বুখারী)।

হানযালা বিন কায়েসের তৃতীয় বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত রাফে' (রা) বলেছেন ঃ

حد ثنى عماى انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شىء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذالك فقلت لرافع فكيف هى بالدينار والدرهم -

"আমার দু'জন চাচা আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে লোকেরা নিজেদের জমির সেই উৎপাদনের বিনিময়ে কেরায়া দিত যা পানির নালার নিকট উৎপাদিত হতো অথবা জমির সেই অংশে উৎপাদিত হত যা মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে তা করা কিরূপ? রাফে' (রা) বললেন, এতে কোন দোষ নেই।" (বুখারী , আহমাদ, নাসাঈ)।

হানযালার সূত্রে হযরত রাফে' (রা)–এর আর একটি বর্ণনা এসেছে। এর ভাষ্য হলো :

كنا اكثر الانصار حقلا ، كنا نكرى الارض على ان لنا هذه
ولهم هذه – فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذالك–
واما الورق فلم ينهنا – (مسلم – ابن ماجه – بخارى)

(কিন্তু বুখারীতে اما الورق فلم ينهنا শব্দ নেই।)

"আমরা আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাষাবাদকারী ছিলাম। যমীনের এ অংশের ফসল তোমার আর ওই অংশের ফসল আমার—এভাবে আমরা জমি কেরায়া দিতাম। কখনো এমন হতো যে, এক অংশে ফসল ভাল হতো আর অন্য অংশে ফসল কম হতো বা হতো না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এ ধরনের কারবার করতে নিষেধ করেন। তবে রূপার বিনিময়ে কারবার করা (জমির নগদ ভাড়া) তিনি নিষেধ করেননি।"

স্বয়ং হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর চাচাত ভাই উসাইদ বিন হুযাইর (রা) বর্ণনা করেছেন :

كان احدنا اذا استغنى عن ارضه او افتقر اليها اعطاها
بالثلث والربع والنصف واشترط ثلث جذول والقصارة

وما يسقى الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ، يصبب منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعًا وطاعة الله وطاعة رسوله انفع لكم ان رسول الله ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن ارضه فليمنحها اخاه او ليدع –

"আমাদের কেউ কেউ যখন সরাসরি চাষাবাদের কাজ থেকে বিরত হত অথবা জমি কেরায়ায় দেবার প্রয়োজন অনুভব করতো তখন এক–তৃতীয়াংশ অথবা এক–চতুর্থাংশ অথবা উৎপাদনের অর্ধেকের বিনিময়ে তা অন্যকে দিয়ে দিতো এবং সাথে সাথে শর্ত আরোপ করতো যে, নালা ও গাঁঠগুলো (বা ঘন্টিগুলো)[১] এবং বড় নালার আশে পাশের উৎপাদিত ফসল তার। সে সময় জীবন ধারণ ছিল বড়ই কষ্টকর। মানুষ সারাদিন ধরে চাষাবাদ অথবা অন্য কোন কষ্টকর কাজ করে সামান্য জীবিকা উপার্জন করতে পারতো। একদিন রাফে' বিন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এলেন এবং বলতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের এসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য অধিক লাভজনক। রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জমি চাষাবাদ করা

---

১. অভিধানে قصارى এবং قصرى -এর অর্থ হলো بقية الحب فى سنبل بعد ما يداس অর্থাৎ মাড়াইয়ের পরে শস্যের শীষের মধ্যে যে দু'একটা শস্য থেকে যায়। যেহেতু আমি নিজে কৃষিজীবী নই, তাই আমার জানা নেই উর্দু ভাষায় একে কি বলা হয়। কারাগারে আমার দু' সাথী মাশাআল্লাহ চাষাবাদের ব্যাপারেও অভিজ্ঞ। তাই তাদের কথার উপর নির্ভর করে আমি এ শব্দের তর্জমা 'গাঁঠ' অথবা 'ঘন্টি' (শস্য কণা) লিখেছি। 'গাঁঠের' বর্ণনাকারী হলেন মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী সাহেব ও 'ঘন্টির' বর্ণনাকারী হলেন মিঞা তোফায়েল মোহাম্মদ সাহেব। সম্ভবত এ হলো পাঞ্জাব ও ইউপির পরিভাষাগত পার্থক্য।

হতে মুক্ত হতে চায়, সে যেন তা তার কোন ভাইকে বিনা মূল্যে দিয়ে দেয় অথবা অনাবাদী রেখে দেয়।[১] (আবু দাউদ, আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা)—এর ব্যাখ্যা

হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)'র মত হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা)–কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন আসল বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সা) নিষিদ্ধ করেছেন তা বেরিয়ে এলো –

كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا – فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليز رعها او ليحرثها اخاه والافليدعها – (احمد – مسلم)

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে জমি ভাগচাষে দিতাম। কিছু গাঁঠ (অথবা ঘন্টি) হতে এবং কিছু এ জিনিস থেকে কিছু ওই জিনিস থেকেও উসূল করতাম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে। অথবা তার কোন ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়, অন্যথায় অনাবাদী ফেলে রাখবে।"

---

১. এখানে এ কথা জেনে রাখাও কম উৎসাহজনক নয় যে, হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রা)–এর বয়স নবী করীম (সা)–এর ওফাতের সময় বড় জোর ২২ বছর ছিল। এতে অনুমান করা যায় যে, একজন উনিশ বিশ বছরের যুবকের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)–এর কথা শুনা ও বুঝার এবং অন্যদের নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করার মধ্যে কিছু না কিছু ভুল করে ফেলা খুব বেশী অসম্ভব কিছু ছিল না।

হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)—এর ব্যাখ্যা

উরওয়াহ বিন জুবাইর হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه – انما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا ، فقال ان كان هذا شانكم فلا تكروالمزارع – فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكررو والمزارع – (ابو داود ، ابن ماجه)

"আল্লাহ. রাফে' বিন খাদীজকে মাফ করুন। আমি বিষয়টি তাঁর চেয়ে বেশী জানি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট এলো। তাদের মধ্যে (জায়গা জমির ব্যাপারে) ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে ইরশাদ করলেন ঃ যদি তোমাদের অবস্থা এমন হয় তাহলে তোমরা তোমাদের জায়গা–জমি বর্গায় চাষাবাদ করো না। রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুধু এতটুকু কথাই শুনছিল যে, 'তোমাদের জমি বর্গায় দিও না'।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা)—এর ব্যাখ্যা

হযরত সা'দ (রা) এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো ঃ

ان إصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت فجاؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذالك فنهاهم ان يكروا بذالك – وقال اكروا بالذهب والفضة – (احمد– نسائي)

"রাসূলুল্লাহ (সা)–এর যুগে জমির মালিকগণের রীতি ছিল তারা নিজেদের জমি এই শর্তে বর্গা চাষে দিত যে, নালার দু'পাশের (জমির) উৎপাদিত ফসল এবং জমির যেসব জায়গায় এমনিতেই পানি পৌছে যায় ঐসব জায়গার ফসল মালিকের। এ ব্যাপার নিয়ে লোকদের মধ্যে ঝগড়া বাধলো। এ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ রাসূলুল্লাহ (সা)–এর নিকট এলে তিনি উল্লেখিত শর্তে জমি বর্গা চাষে দেয়া নিষেধ করে দিলেন। তিনি আরো বললেন, সোনা রূপার বিনিময়ে তোমরা কেরায়া ঠিক করে নাও।" (আহমাদ, নাসাঈ)।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন :

كنا نكر الارض بما على السواقى من الزرع وما سعد بالماء منها - فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك وامرنا ان نكريها بذهب اوفضة - (ابو داود)

"আমরা জায়গা–জমি এই শর্তে বর্গা চাষে লাগাতাম যে, জমির যেসব অংশ পানির নালার আশেপাশে আছে এবং যেসব জায়গায় পানি নিজে নিজে পৌছে যায় সেসব জায়গার উৎপাদিত ফসল মালিকের। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এ ধরনের কারবার করতে নিষেধ করেছেন এবং সোনা রূপার বিনিময়ে কেরায়া ঠিক করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" (আবু দাউদ)

ইবনে আব্বাস (রা)—এর ব্যাখ্যা

হযরত তাউস (র) হলেন তাবিঈদের মধ্যে প্রখ্যাত ফকীহ। তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)–এর নিকট হতে যা জেনেছেন তা এ ব্যাপারে অবশিষ্ট সন্দেহও দূর করে দেয়। তিনি বলেছেন :

لما سمع اكثر الناس فى كراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامنحها احدكم اخاه (اى قاله تحريضا للناس على الاحسان) ولم ينه عن كرائها

"জমি বর্গা চাষে দেয়ার ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) মানুষের বিভিন্ন কথা শুনে বিস্মিত হয়ে 'সুব্‌হানাল্লাহ' পড়লেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তো শুধু এ কথা বলেছেন : তোমরা তোমাদের ভাই-বন্ধুদেরকে জমি-জমা নিস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দিচ্ছ না কেন? (অর্থাৎ তিনি লোকদের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন) তিনি কেরায়ায় জমি দেয়া নিষিদ্ধ করেননি।" (ইবনে মাজাহ)।

অপর এক বিস্তারিত বর্ণনায় আছে যে, তাউস (র) তাঁর নিজের জমি ভাগচাষে দিতেন। এ ব্যাপারে মুজাহিদ (র) তাঁকে বললেন, চলুন রাফে' বিন খাদীজ (রা)-এর ছেলের নিকট যাই। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এ সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাউস (র) তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ভাগ চাষ নিষিদ্ধ করেছেন তাহলে আমি অবশ্যই এ কাজ করতাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি রাফে' বিন খাদীজ (রা) থেকে বেশী জ্ঞানী অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তিনি আমাকে বলেছেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خيرله من ان ياخذ عليها خرجا معلوما -

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন : কোন ব্যক্তি যেন তাঁর জমি তার ভাইকে নিস্বার্থভাবে দিয়ে দেয়। যদি সে তা করে তবে এটা হবে নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয়ার চেয়ে উত্তম।"

অন্য এক জায়গায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা হলো :

ان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها - انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما

"নবী করীম (সা) এ থেকে (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তিনি তো শুধু এ কথা বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে তার জমি বিনিময় ছাড়াই দিয়ে দেয় তাহলে এটা হবে তার থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় নেয়ার চেয়ে উত্তম।"

অপর এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এভাবে বলেছেন :

لم يحرم المزاعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض

"বর্গা চাষাবাদ রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম করেননি। তিনি বরং লোকদের পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার কথা বলেছিলেন।"

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)।

বিষয়টির পর্যালোচনা

সাক্ষ্য এবং হাদীসভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণের উপর একটি সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যে সত্য উন্মুক্ত হয়ে সামনে আসে তা হচ্ছে,

(১) ইসলাম এরূপ কল্পনার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে, কৃষি বিষয়ক সম্পত্তির মালিকানা অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা হতে ভিন্নতর—যার ভিত্তিতে অন্য সব মালিকানার বিপরীত জমির বৈধ মালিকানার জন্য আয়তনের দিক থেকে কোন নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিতে হবে, অথবা এই ফায়সালা করতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং পরিবারের দখলে শুধু তাদের চাষাবাদের পরিমাণ ভূমি থাকবে, অথবা চাষাবাদ করার অতিরিক্ত পরিমাণ জমির মালিকানার অধিকার দেবার পর অন্য এমনসব শর্ত জুড়ে দেয়া হবে যার দরুন এ মালিকানা অর্থহীন হয়ে পড়বে। এরূপ সীমাবদ্ধতা আরোপের জন্য মূলত কুরআন ও হাদীসে কোন ভিত্তি বিদ্যমান নেই।

(২) যে ব্যক্তি নিজে চাষাবাদ করবে না বা করতে পারবে না অথবা নিজে চাষাবাদ করার অতিরিক্ত জমির মালিক, শরীয়াত তাকে এ অধিকার দিয়েছে যে, তার নিজের জমিতে সে অন্যকে দিয়ে চাষাবাদ করাবে এবং উৎপাদনের অংশ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা আধা-আধি ইত্যাদি শর্ত ঠিক করে নেবে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে, কারিগরি বা এ জাতীয় ব্যবসায়ে মুদারাবাত (অংশীদারিত্ব) জায়েয ঠিক তেমনি চাষাবাদের ক্ষেত্রেও মুযারায়াত (ভাগচাষ) জায়েয।

(৩) কিন্তু মুদারাবাতের মত মুযারায়াতও সহজ পন্থায়ই জায়েয। অর্থাৎ জমির মালিক ও চাষীর মধ্যে অংশ বন্টন অত্যন্ত সোজা পন্থায় এভাবে হয় যে, জমিতে যত ফসলই উৎপাদিত হবে তা তাদের নির্ধারিত হার অনুযায়ী বন্টিত হবে। এর সাথে এমন কোন শর্ত জুড়ে দেয়া যাবে না যার ফলে এক পক্ষের অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, আর অপরপক্ষের অংশ থাকবে সংশয়যুক্ত, অথবা যাতে একপক্ষের বা উভয়পক্ষের অংশ শুধু ভাগ্যের ঘটনা চক্রের উপর নির্ভরশীল হবে—এ ধরনের শর্ত গোটা ব্যাপারটাকেই নাজায়েয করে দেবে। কারণ এ ধরনের শর্তসমূহ ভাগচাষ প্রথায় সূদ ও জুয়ার বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি করে।

(৪) এখন জমি নগদ লাগানোর ব্যাপারে বলা যায় যে, এটা যদি জমি কেরায়ার (ভাড়া) মত হয় তাহলে জায়েয। কিন্তু জমির মালিক যদি অনুমানে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিজের জন্য একটা নির্দিষ্ট অংকের আকারে অথবা উৎপাদনের আকারে নির্দিষ্ট করে নেয় তাহলে নীতিগতভাবে এর মধ্যে এবং সূদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেরায়ার ক্ষেত্রে শুধু এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মালিক নিজের জিনিসকে কেরায়া গ্রহীতার জন্য সহজলভ্য করার ও প্রস্তুত রাখার এবং তাতে কেরায়াদারের ব্যাবহারের ফলে তার মালের যে ক্ষতি হয় এর যেন বিনিময়ের দাবী করতে পারে। সে জিনিস চাই বাড়ী হোক, বা আসবাবপত্র, যানবাহন অথবা জমি। মোটকথা এ দিক থেকে এর বিনিময় অবশ্যই নেয়া যায়। আর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশী ক্ষতি অথবা কম ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে এর বিনিময় হারেও কম বেশী হতে পারে। কিন্তু মালিক যদি বিনিময় এভাবে নির্দিষ্ট করে যে, ভাড়া গ্রহীতা যে অর্থনৈতিক কারবারে তার জিনিস ব্যবহার করবে তাতে আনুমানিক এত পরিমাণ লাভ হবে। কাজেই তা থেকে তাকে এত লাভ অবশ্যই দিতে হবে তাহলে এ গোটা বিনিময়টাই সূদে পরিণত হয়ে যাবে। চাই তা বাড়ীর ক্ষেত্রেই হোক অথবা যানবাহন বা জমির ক্ষেত্রেই হোক। যে ব্যক্তি কেরায়া গ্রহীতার মুনাফায় অংশ নেবার ইচ্ছা রাখে তাকে সরাসরি মুদারাবাতের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে অথবা মুযারায়াত বা বর্গা চাষ করতে হবে। যদি সে কৃষিজ উৎপাদনের মুনাফায় অংশ নিতে চায়। কিন্তু এক পক্ষের অংশ একটা বিশেষ অংকের আকারে নির্দিষ্ট করা হবে আর অন্য পক্ষের অংশ

থাকবে সন্দেহযুক্ত এবং ভাগ্য ও দৈবাৎ ঘটনার উপর নির্ভরশীল এটা না ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্প উৎপাদনে জায়েয আর না চাষাবাদের ক্ষেত্রে জায়েয।

ফিক্‌হবিদদের মাযহাব

অবশেষে এ ব্যাপারে ইসলামের ফকীহগণের বিভিন্ন মাযহাবের ফতোয়ার দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করুন। আল্লামা শাওকানী (র) তাঁর নায়লুল আওতারে লিখেছেন ঃ

> "হাযিমী বলেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), আম্মার বিন ইয়াসের (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, মুহাম্মাদ বিন সীরীন, উমর বিন আবদুল আযীয (র), ইবনে আবু লাইলা (র), ইবনে শিহাব যুহরী (র) এবং হানাফী মাযহাবের কাজী আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ বিন হাসান (র) বলেছেন, জমির উৎপাদিত ফসল এবং বাগানের ফল উভয়ের ব্যাপারেই ভাগাভাগীতে জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে এবং বাগানের মালিক ও বাগানীর মধ্যে কারবার হতে পারে।[১] এ উভয় ব্যাপার এক সাথেও হতে পারে—যেমন খায়বারে একই দলের সাথে বাগানের দেখা শুনা আর জমির চাষাবাদের কাজ কারবার একত্রে ঠিক হয়েছিল। আবার ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে। যেসব হাদীসে বর্গা প্রথার নিষেধাজ্ঞা এসেছে এর জবাবে তাঁরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলো হলো তানযীহী পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞার (না করাই উত্তম) উপর ভিত্তিশীল। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, জমির মালিক যদি জমির বিশেষ বিশেষ অংশের উৎপাদনকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় তাহলে তখনই তা নিষিদ্ধ।

---

১. এসব ব্যক্তিগণ ছাড়া সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), উমার (রা), সাদ (রা) বিন আবু ওয়াক্কাস, যুবাইর (রা) বিন আওয়াম, উসামা বিন যায়েদ, মুয়ায বিন জাবাল, ইবনে উমার (রা) খাব্বাব (রা) বিন আরাত্ত, ইবনে আব্বাস (রা) এবং ফিক্‌হবিদদের মধ্যে তাউস, আওযায়ী এবং সাওরী (র)—এরও এই মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। এদের অধিকাংশের উক্তি আমার পূর্ব বর্ণিত রাওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে।

তাউসসহ একটি ক্ষুদ্র দল বলেছেন, ভাগচাষে জমি লাগানো একেবারেই নাজায়েয। তা চাই জমির এক অংশের ভাগের মত হোক অথবা সোনা রূপার বিনিময়ে হোক অথবা অন্য কোনরূপে হোক।[১] ইবনে হাযমও এ দলকে সমর্থন করেছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ মতের পোষকতা করে ওই হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যাতে সরাসরি ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছে।[২]

ইমাম শাফেয়ী (র), আবু হানিফা (র), ইতরত (অর্থাৎ ফুকাহায়ে ইমামিয়া) এবং আরো অনেকে বলেছেন, জমির কেরায়া ওই সব জিনিসের বিনিময়ে হতে পারবে যা কোন জিনিস বেচা-কেনার ব্যাপারে মূল্য হিসেবে কাজে লাগে। তা চাই সোনা হোক কি রূপা, কি ব্যবহারিক আসবাবপত্র অথবা রবি শস্য। কিন্তু এই কেরায়া ওই জমির উৎপাদনের এক অংশরূপে ঠিক হতে পারবে না যা কেরায়ায় দেয়া হয়। ইবনুল মুনযির বলেন, সোনা-রূপার মাধ্যমে জমি ভাড়ায় ঠিক করার বৈধতার উপর সকল সাহাবী একমত। ইবনে বাততাল বলেছেন, সকল ফুকাহায়ে আনসারও এটা জায়েয হবার ব্যাপারে একমত।

কিন্তু উৎপাদনের বিনিময়ে দেয়া নাজায়েয হওয়ার পক্ষে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ওই সব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যা এটা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। আর খায়বারের বিষয়ের জবাব এভাবে দিচ্ছেন যে, খায়বার তো অস্ত্র বলে বিজিত হয়েছে। আর এর অধিবাসীরা

---

১. বিস্ময়ের ব্যাপার হলো মুযারায়াত 'নাজায়েয'; এ মতটা তাউসের বলে এখানে কিভাবে বলা হলো। অথচ ভাগচাষ জায়েয ও নগদ বিক্রি নাজায়েযই ছিল তাউসের মত। (নায়লুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬)

২. এ মাযহাবকেও ইবনে হাযমের মাযহাব বলা সঠিক নয়। ইবনে হাযম স্বয়ং মুহাল্লায় লিখেছেন : আধাআধি কি এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের উৎপাদনের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া খায়বারের হাদীস হতে প্রমাণিত। এ ছিল তার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা আমৃত্যু জারী ছিল। এবং তাঁর পরে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমার (রা) এবং সকল সাহাবী এর উপর আমল করেছেন। অতএব তাঁর এ সর্বশেষ কাজ এসব হাদীসের ওই অংশের রহিতকারী বলে গণ্য হবে যেখানে ভাগচাষকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন অবশিষ্ট রইলো ওই সব বর্ণনায় এই অংশ যাতে নগদ ভাড়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এ নিষেধ স্ব অবস্থায়ই কায়েম থাকবে। কারণ এ অংশ নাসেখ হবার কোন নস্ বা হুকুম পাওয়া যায় না। (আলমুহাল্লা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই তিনি ওখানকার উৎপাদনের যা কিছু নিজে নিয়েছেন তা তাঁরই ছিল। আর যা কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন তাও তাঁরই ছিল। হাযিমী বলেছেন, এ মতটি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত রাফে' বিন খাদীজ, হযরত উসাইদ বিন হুদাইর, হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত নাফে' (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।[১] ইমাম মালিক (র), শাফেয়ী(র) এবং কুফাবাসীদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব হলো শস্য ও ফল ছাড়া অন্য যে কোন আকারে জমি কেরায়া দেয়া জায়েয। আর শস্য ও ফলের আকারে কেরায়া নিতে তিনি এ জন্য নিষিদ্ধ করেন যে, এটা যেন শস্য দিয়ে শস্য ক্রয় করার ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় এবং তাঁর মতে নেতিবাচক বিধানের মূল উদ্দেশ্য এটাই। ফাতহুল বারীর লেখক [ইবনে হাজার (র)] তাঁর মাযহাব এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনুল মুনযির বলেছেন—ইমাম মালিকের কথার এই অর্থ গ্রহণ করা উচিত যে, কেরায়া যদি ওই শস্যের মধ্যে ঠিক হয় যা কেরায়া দেয়া জমিতে উৎপাদিত হয় তাহলে এটা নাজায়েয হবে। কিন্তু জমি কেরায়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য প্রদানের দায়িত্ব নেয় অথবা তার হাতে মওজুদ শস্যে মালিকের দাবী পূরণ করে তাহলে এর বৈধতার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেন, স্বয়ং জমির উৎপাদনের একটি অংশ কেরায়া হিসেবে নির্দিষ্ট করা জায়েয তবে শর্ত হচ্ছে বীজ জমির মালিকের হতে হবে। ইমাম আহমদের এ মাযহাবের কথা হাযিমী বর্ণনা করেছেন। (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড,পৃঃ ২৩২)

বর্তমানে الفقه على المذاهب الاربعة (আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া) নামে একটি উত্তম কিতাব মিসর হতে প্রকাশিত

১. তাঁদের অধিকাংশ ব্যক্তির সাথে উক্ত মত সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়।

হয়েছে। এতে ইসলামী ফিক্‌হের চারটি মাযহাবের বিধান অত্যন্ত উত্তম পন্থায় ও বিস্তারিতভাবে তাদের মূল গ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে। এর তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে মুযারায়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নীচে আমরা এর একটি অত্যাবশ্যকীয় সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ করছি যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং দেখতে পারেন যে, এ বিষয়ে ইসলামের ফিক্‌হভিত্তিক মাযহাবগুলোর ফতোয়া কি?

হানাফী মাযহাবের আলোচনা

প্রকৃতপক্ষে মুযারায়াত (ভাগচাষ) হলো, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে এমন একটা চুক্তি যার আলোকে চাষী হয় প্রতিদানের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে নেয়—এই শর্তে যে, সে জমিতে নিজের শ্রম নিয়োজিত করবে এবং উৎপাদনের একটি অংশ জমির মালিককে প্রতিদান হিসেবে প্রদান করবে, অথবা জমির মালিক কৃষকের শ্রম প্রতিদানের বিনিময়ে গ্রহণ করে—এই শর্তে যে, কৃষক তার জমিতে কাজ করবে এবং উৎপাদনের একটি অংশ কাজের প্রতিদান হিসেবে সে পাবে।

এ ধরনের বিষয়ের হানাফী মাযহাবেও মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন—এটা নাজায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন, এটা জায়েয। হানাফী মাযহাবের ফতোয়া এই শেষোক্ত দু'জন সম্মানিত ইমামের মতের উপর ইমাম আবু হানীফার মতের উপরে নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ভাগচাষকে সাধারণতই নাজায়েয বলেন না। বরং তাঁর মতে জমির মালিক যদি জমি দিয়েই পৃথক হয়ে না যায়, বরং বীজ, হালের বলদ ইত্যাদিতেও কৃষকের সাথে শরীক থাকে তাহলে এ অবস্থায় উৎপাদিত ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা জায়েয।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে (যার উপর হানাফী মাযহাবের ফতোয়া) ভাগচাষের বৈধ রূপগুলো হলো :

(১) জমি একজনের এবং বীজ ও চাষাবাদের উপকরণ, সরঞ্জাম ও শ্রম হবে আর একজনের। উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হবে যে, জমির মালিক

উৎপাদনের এত অংশ (যেমন অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ) পাবে।

(২) জমি, বীজ ও চাষাবাদের উপকরণ সব কিছুই হবে মালিকের শুধু শ্রম হবে অপর জনের। এ অবস্থায় এ সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে হবে যে, শ্রম নিয়োগকারী উৎপাদনের এত অংশ পাবে।

(৩) জমি ও বীজ মালিক দিবে। চাষাবাদের সরঞ্জাম ও শ্রম দেবে আর একজন। এরপর উভয়ের অংশের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে যেতে হবে।

(৪) জমিও হবে উভয়ের, বীজও উভয়েই সংগ্রহ করবে। চাষাবাদের সরঞ্জাম এবং শ্রমেও উভয়েই শরীক থাকবে, অতপর আপোসে অংশ নির্ধারণ করে নেবে।

এ ক্ষেত্রে নাজায়েয পদ্ধতিগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

(১) জমি হবে দু' পক্ষেরই এবং এক পক্ষ জমির সাথে শুধু বীজ দেবে। আর দ্বিতীয় পক্ষ দেবে জমির সাথে হাল গরু। (কোন কোন আলেম এ অবস্থাটিকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন যদি কোন অঞ্চলে এ পদ্ধতির সাধারণ প্রচলন হয়ে থাকে)।

(২) জমি হবে একজনের, অপরজনের হবে বীজ, তৃতীয়জনের হাল-গরু এবং চতুর্থজনের শ্রম। অথবা হাল-গরু ও শ্রম হবে তৃতীয় জনের।

(৩) বীজ ও হাল-গরু একজনের আর শ্রম ও জমি আরেক জনের।

(৪) জমি একজনের কিন্তু বীজ দেবে দু'জনেই। আর শ্রমের ব্যাপারে শর্ত হবে যে, জমির মালিক ছাড়া আর কেউ তা করবে।

(৫) কোন এক পক্ষের অংশ পরিমাণের রূপে (যেমন ৫০ মণ কি ১০০ মণ) নির্ধারিত হবে অথবা ভাগের অংশ ছাড়াও একটি বিশেষ পরিমাণ শস্য অতিরিক্ত নেবে। অথবা ওই জমির উৎপাদন ছাড়া আর কোন ধরনের কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব কোন পক্ষের উপর বর্তাবে।

হাম্বলী মাযহাব

এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবও প্রায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, হাম্বলী মাযহাব জমির মালিকের বীজ দেয়াকে আবশ্যকীয় বলে মনে করে। কিন্তু মনে হচ্ছে হাম্বলী মাযহাবের আলেমরা পরে এ শর্ত কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। বস্তুত الفقه على المذاهب الاربعه -এর লেখক সামনে অগ্রসর হয়ে হাম্বলী মাযহাবের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"জমির মালিকের তরফ থেকে বীজ দেয়া শর্ত না হওয়াই সঠিক। প্রকৃতপক্ষে শর্ত হলো, উভয় পক্ষেরই কিছু মূল জিনিস প্রদান করা। এক ব্যক্তি শুধু জমি দেবে আর অপর ব্যক্তি বীজ, শ্রম, চাষাবাদের সরঞ্জামে শরীক হবে এটাও সঠিক। আর এটাও সঠিক যে, বীজ অথবা হাল গরু অথবা উভয়ই দেয়া জমির মালিকের দায়িত্ব। অন্য জনের দায়িত্ব হবে শ্রম ও বীজ অথবা শ্রম ও হাল-গরু দেয়া (ঐ, পৃষ্ঠা ২১)।

মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাব অনুযায়ী ভাগচাষের এই পন্থা জায়েয যে, এক ব্যক্তি জমি দেবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বীজ, শ্রম ও সরঞ্জামের সাথে শরীক হবে এবং উৎপাদন উভয়পক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেবে। পক্ষান্তরে ভাগচাষের যে পন্থাটি তাঁরা প্রস্তাব করেছেন তাহলো— জমি, শ্রম এবং চাষাবাদের সরঞ্জামের মধ্যে প্রত্যেকের মূল্য টাকায় অথবা ব্যবসায়ের সম্পদে (শস্য ছাড়া) হিসাব করে নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যেমন জমিকে এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করার মূল্য পঞ্চাশ টাকা অথবা এত গজ কাপড়। আর এ সময়ে ব্যবহৃত চাষাবাদের সরঞ্জাম যা দ্বারা কাজ করা হবে তা ব্যবহারের মূল্য হবে এ পরিমাণ। এরপর যে পক্ষ এর মধ্যে যে যে জিনিসের সাথে শরীক হবে সে সম্পর্কে এ কথা ঠিক করে নিতে হবে যে, সে যেন এত পুঁজি নিয়ে এ যৌথ কারবারে অংশীদার হচ্ছে। কিন্তু উভয় পক্ষই সমপরিমাণ বীজ অবশ্যই দেবে। এ যৌথ ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তাদের পুঁজি অনুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যে ভাগ হবে যা নিয়ে সে শরীক আছে।

শাফেয়ী মাযহাব

শাফেয়ীগণের মতে ভাগচাষের সব ধরনই নাজায়েয। চাই বীজ ও জমি মালিকের হোক। তাদের চিন্তা হলো জমির বিনিময় মূল্য স্বয়ং ওই জমির উৎপাদনের একটি অংশকে নির্ধারণ করাই জায়েয নয়। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় কৃষক তার ভাগে কত শস্য পাওয়া যাবে তা না জেনেই শ্রম বিনিয়োগ করে। তাই এটা হলো ধোঁকার ব্যবসা। এর পরিবর্তে সঠিকরূপ হলো—হয় জমির মালিক একটি নির্দিষ্ট মূল্যে কৃষকের শ্রম গ্রহণ করবে। ফসল হবে মালিকের। অথবা কৃষক একটি নির্দিষ্ট মূল্যে মালিকের নিকট হতে জমি নিয়ে নেবে। আর ফসল হবে কৃষকের। এ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কারবারের পরিবর্তে এমন কাজ কেন করা হবে, যে কাজে কোন পক্ষই জানছে না তার ভাগে কি আসবে? শাফেয়ী মাযহাবের কথা হলো হাদীসে মুখাবারা ও মুযারায়াতের যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার অর্থ এটাই।

কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে এক ব্যক্তি তার বাগান অন্যকে দেখা-শুনা করার জন্য দেয়া এবং তার শ্রমের নগদ মূল্য নির্ধারণ করার পরিবর্তে ফসল দিয়ে অংশ ঠিক করে নেয়া জায়েয। বাগানে যদি চাষাবাদের জন্য কিছু জায়গা খালি থাকে তাহলে ওই জায়গা চাষাবাদের জন্য বাগানের মালিক সে জমির উৎপাদনে নিজের অংশ বর্গার ভিত্তিতে ঠিক করে নেয়াও জায়েয। অবশ্য এতে শর্ত হলো এ চাষাবাদ যেন স্বস্থানে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার হিসেবে না দাঁড়ায়। বরং বাগানের কাজের মধ্যেই শামিল ও তার অধীন থাকে এবং যার সাথে বাগানের ব্যাপারটা ঠিক হয়েছে তার সাথেই এটাও ঠিক করে নিতে হবে।

এই বিস্তারিত আলোচনার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাহিরী ফেরকার একটি দল ছাড়া গোটা উম্মতের খ্যাতনামা আইনজ্ঞদের কেউই এ মত পোষণ করেন না যে, কৃষিজাত সম্পত্তির মালিকানাকে স্ব স্ব চাষাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অথবা স্বয়ং চাষাবাদের অতিরিক্ত যত জমি মানুষের নিকট থাকবে তা বিনা মূল্যে অন্যকে দিতে হবে অথবা অকেজো ফেলে রাখা ছাড়া তা ব্যবহার করার তৃতীয় আর

কোন পথ শরীয়াতে নেই। অতিরিক্ত জমি অন্যকে দিয়ে চাষাবাদ করাবার কোন্ নিয়ম জায়েয আর কোন্ নিয়ম জায়েয নয় তা নিয়ে বিভিন্ন মাযহাবে বিভিন্ন মত আছে। কিন্তু ফিক্‌হের প্রত্যেক মাযহাবেই নিজের জমি অন্যকে দিয়ে চাষাবাদ করাবার কোন না কোন পদ্ধতি অবশ্যই জায়েয আছে।

সংস্কারের সীমা ও পন্থা

নিসন্দেহে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বর্তমান ব্যবস্থা খুবই ত্রুটিপূর্ণ ও ইনসাফ বর্জিত। জমিদারী আর জায়গীরদারী প্রথা এত বেশী কলূষিত হয়ে পড়েছে যে, এর বিষাক্ত ছোবলে আমাদের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সংস্কারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এই অবক্ষয় দূর করতে হবে—এতে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যারা সংস্কারের নাম নিচ্ছেন তাদের বাইরের অবক্ষয় সম্পর্কে চিন্তা করার পূর্বে তাদের নিজেদের ভেতরের অবক্ষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কেননা, একটি অস্বচ্ছ ও উদভ্রান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে যদি সে বাইরের সংস্কারের কাঁচি চালানো শুরু করে তাহলে সে অতীতের কলূষতাগুলো দূর করার পরিবর্তে আরেক নতুন কলূষতার দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করবে।

সর্বপ্রথম তাদেরকে তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তাদের কোন ধর্ম আছে কিনা, যদি থাকে তবে তা কি ইসলাম না অন্য কিছু? যদি তাদের কোন দীন না থাকে, অথবা যদি থাকে তবে তা যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে সংস্কারের জন্য নিজেদের কোন আবিষ্কৃত মতবাদ পেশ করে দেবার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে, অথবা অন্য কোথাও থেকে কোন মতবাদ ধার করে এনে তা কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করতে পারে। কিন্তু যাই হোক এসব অবশ্যই তাদের নিজেদের নামে করতে হবে অথবা তাদের সেই নেতার নামে করতে হবে যার অনুসরণ তারা করছে। তাদের মনগড়া অথবা অন্যদের উদ্ভাবিত প্রস্তাবসমূহ জোরপূর্বক টেনে এনে ইসলামের ঘাড়ে চাপানোর এবং ইসলামের নামে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা চালানোর অধিকার কোন অবস্থাতেই তাদের নেই। তাদের যদি কোন ধর্ম থাকে আর তা যদি হয় ইসলাম, কিন্তু কার্যত তারা তা অনুসরণ করে চলতে চায় না তারপরও তাদের গুনাহ করার অধিকার তো অবশ্যই আছে। কিন্তু অন্তত যৌক্তিকতার সীমার মধ্যে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং তাকে উপেক্ষা করে তারা নিজেরা মনগড়াভাবে যে বিধান রচনা করবে অথবা অন্য কোথাও থেকে ধার

করে এনে তাকে অযথা "খাঁটি ইসলাম" সাব্যস্ত করার সুযোগ তাদের মোটেও নেই।

তারপরও যদি তারা স্বীকার করে যে, বাস্তবিকই তাদের একটি দীন আছে এবং তা ইসলামই, আর তাদেরকে তা মেনেও চলতে হবে—তাহলে ইসলামের নামে কোন সংস্কারকার্য শুরু করার পূর্বে তাদেরকে কিছু প্রাথমিক কথা অবশ্যই জেনে নিতে হবে। তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম আমাদেরকে "আদল" ও "ইনসাফ" নামের শব্দই দান করেনি, বরং সাথে সাথে এগুলোর তাৎপর্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ধারণা এবং বাস্তব নকশাও দান করেছে। অতএব আমাদের যদি ইসলামের ন্যায়নীতি কায়েম করতে হয় তবে আমাদেরকে শুধু 'ইনসাফ' শব্দটিই ইসলামের অভিধান থেকে গ্রহণ করলে চলবে না—বরং তার ধারণা এবং তার বাস্তব নকশাও ইসলামের বিধান থেকেই গ্রহণ করতে হবে। তাদের আরও জানতে হবে যে, ইসলাম কোন শিশুর খেলনা নয় যে, যেসব লোক তার ব্যবস্থা, মূলনীতি ও আইন-কানুন বুঝার জন্য নিজেদের জীবনের ক্ষণিক সময়ও ব্যয় করেনি তারা এদিক সেদিক থেকে কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস একত্র করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বড় বড় দীনী বিষয়ের 'মুজতাহিদ' সুলভ রায় দান করে বসবে এবং উল্টো ওইসব লোকদের নির্বোধ বানানোর চেষ্টা করবে যাঁরা এই দীনের ব্যবস্থা ও বিধানাবলী বুঝার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। অথবা কতিপয় নবাবযাদা ও গুটিকয়েক উকিল-ব্যারিস্টার সাহেব একত্রে বসে সম্পূর্ণ পার্থিব স্বার্থ ও সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে একটি সংস্কারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, অতপর ইসলামের নামেই শুধু তা পেশ করেই ক্ষান্ত হবে না বরং নির্ভীকভাবে এ কথাও বলে দিবে যে, যেসব মৌলভী সাহেব ও মাওলানা সাহেব তাদের মত অনুযায়ী ফতুয়া দেবে, কেবল তারাই দীন সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এটা শুধু মূর্খতাই নয় বরং নিরেট অজ্ঞতা। এ ধরনের সংস্কারবাদীদের জানা উচিত যে, এই আচরণ কোন বুদ্ধিমান লোকের জন্য শোভা পায় না। তাদের জানা উচিত ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যার রয়েছে একটি স্থায়ী জীবন-দর্শন, বিশ্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন নীতিমালা এবং বিশেষ আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা। দীনের জ্ঞান অর্জন না করেই যা ইচ্ছা তা মনগড়াভাবে বলে দেবার অথবা অন্য জায়গা হতে ধার এনে এ জীবন বিধানে

ঢুকিয়ে দেবার অধিকার কোন মানুষের নেই। অথবা ভাসা ভাসা জ্ঞানের উপর ভর করে মুজতাহিদদের আসনে জেঁকে বসার এবং নিজের চিন্তার ভুল উৎপাদনকেই নিশ্চিত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত হিসেবে আমদানী করার অধিকার কারো নেই। তাদের জানা উচিত যে, বর্তমান ত্রুটিগুলোর সংশোধন এবং একটি নতুন সংস্কারমুখী জীবন বিধানের ভিত্তি যদি আমরা নিজেদের সুধারণা অনুযায়ী করি তবে তাকে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট করা ভুল। এ কাজ যদি আমাদেরকে ইসলামের পদ্ধতিতে করতে হয় তবে অবশ্যই আমাদেরকে গোটা সংস্কার-সংশোধন ও পুনর্গঠন ইসলাম নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করেই করতে হবে এবং সেই সব নীতিমালা অনুযায়ী করতে হবে যা ইসলাম আমাদের দান করেছে।

এসব দিক থেকে যদি লোকেরা নিজেদের মনকে ঠিক করে নেয় এবং প্রত্যেকেই (ব্যক্তি ও দল) নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা জেনে নিয়ে নিজের কার্যক্রমকে নিজের যোগ্যতার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে অনেক ভ্রান্তিই দূর হয়ে যাবে—যার কারণে গড়ার পরিবর্তে ধ্বংসের মহড়াই চলছে।

সংস্কারের চারটি সীমারেখা

এরপর যেসব লোক প্রকৃতই ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী সংশোধন চায় এবং মনগড়া কার্যক্রম চালাতে চায় না তাদের সুবিধার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি সংক্ষিপ্তভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করবো যে, ইসলামী আইন কোনসব সীমারেখা টেনে রেখেছে যার আওতায় আমাদের সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, এই সীমারেখার মধ্যে কি কি করার অবকাশ আছে আর কি কি করার অবকাশ নেই।

জাতীয় মালিকানা নাকচ

সংস্কারকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সবার আগে যে জিনিসটি বুঝে নিতে হবে তাহলো উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে জাতীয় মালিকানা বানানোর ধারণাটা মৌলিকভাবেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। কাজেই আমাদেরকে যদি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী জমির 'বন্দোবস্ত' দেয়ার বিষয়টি সংশোধন

করতে হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপেই এমন সব প্রস্তাব বর্জন করতে হবে যেগুলোর উপর ভিত্তি করেই জাতীয় মালিকানার ধারণা একটা মূলনীতি হিসেবে অথবা লক্ষ্য হিসেবে বিদ্যমান। কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, ইসলাম জোরপূর্বক জমির মালিকদের মালিকানা ছিনিয়ে নেবার অনুমতি দেয় না। আবার কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, ইসলাম এমন আইন প্রণয়নের অনুমতি দেয় না যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে নিজের মালিকানা রাষ্ট্রের নিকট বিক্রি করতে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং মূলত ইসলামের সাংস্কৃতি ও সামাজিক দৃষ্টিভংগীই সম্পূর্ণতই এই ধারণার পরিপন্থী যে, জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে এবং গোটা সমাজ এই সংক্ষিপ্তাকার শাসক গোষ্ঠীর গোলাম হয়ে থাকবে—যারা এসব উপায়-উপকরণের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসেছে। যাদের হাতে সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আদালত এবং আইন প্রণয়নের শক্তি রয়েছে সেই হাতেই যদি ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা ও জমিদারীও কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে এর দ্বারা এমন একটি জীবন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় যার চেয়ে অধিক মারাত্মক মানবতা বিধ্বংসী জীবন ব্যবস্থা শয়তানও আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, যদি আত্মসাৎমূলক পন্থায় জমি দখল করা না হয় বরং সরকার পূর্ণ মূল্য দিয়ে সব জমি মালিকের নিকট হতে তাদের সম্মতিতে খরিদ করে নেয় তাহলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোন দোষ নেই। শরীয়াতের আনুসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এতে কোন দোষ না থাকলেও শরীয়াতের সামগ্রীক বিষয় হিসেবে এ ধারণাটাই ভুল যে, সামাজিক সুবিচারের খাতিরে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়-উপকরণ ব্যক্তি মালিকানা হতে বের করে এনে জাতীয় মালিকানার নিগড়ে দিয়ে দিতে হবে। এটা হলো ইনসাফের সমাজতান্ত্রিক ধারণা, ইসলামী ধারণা নয়। আর এই ধারণার ভিত্তিতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হতে পারে, ইসলামী সমাজ নয়। ইসলামী সমাজের জন্য এটা তো খুবই জরুরী যে, এ সমাজের সব না হোক অন্তত অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন হবে এবং এই উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ব্যক্তির হাতে থাকাই আবশ্যক।

সম্পদ বন্টনে সাম্যের ধারণা নাকচ

দ্বিতীয় জিনিস যা আমাদের সংস্কার প্রয়াসী ব্যক্তিগণের মনে রাখা জরুরী, তাহলো—ইসলাম সম্পদের সমবন্টন নীতির প্রবক্তা নয়, বরং ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের প্রবক্তা এবং এই ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের ক্ষেত্রেও সে ইনসাফের নিজস্ব একটা বিশেষ ধারণা রাখে। 'সমবন্টন' কথাটা কেবল কল্পনার স্বর্গমাত্র—প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় যা কায়েম করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিধানই কতকটা এরূপ যে, যদি কোন সময় কৃত্রিমভাবে সম্পদকে সব মানুষের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতে দেয়া হয়ও তথাপি তৎক্ষণাৎ এ সাম্য অসাম্যে পরিণত হতে শুরু করবে, এমনকি কিছু দিনের মধ্যেই এ কৃত্রিম সাম্যের নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণেই যেসব লোক সমবন্টনের নাম নিয়ে উঠেছিল তাদেরকেও অবশেষে এ দাবী হতে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। ইসলাম এ ধরনের খামখেয়ালির অনেক উর্ধে। সে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সমতার পরিবর্তে ইনসাফ কায়েম করতে চায়। আর সে এই ইনসাফের একটি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ রূপ তার আইন-কানুনে, নৈতিক হেদায়াতে এবং সমাজের গঠনপ্রণালীর মধ্যে স্থাপন করে দিয়েছে। তাই আমরা যদি ইসলামী পদ্ধতিতে সংস্কার-সংশোধন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথম পদক্ষেপেই এমন সব প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে যার উদ্দেশ্য কোন রকমে একটা কৃত্রিম সাম্যের প্রতিষ্ঠা। এর পরিবর্তে আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টার সঠিক দিক এই যে, আমাদেরকে ইনসাফের ইসলামী কাঠামোকে অনুধাবন করতে হবে এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে।

মালিকানার বৈধ অধিকারের মর্যাদা

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সম্পর্কে আমাদের সংস্কারকামী ভাইদের অনবহিত থাকা উচিত নয়। তাহলো সাম্যবাদের মত ইসলাম কোন দ্রুতগামী লাগামহীন জীবন-দর্শন নয় যে, কয়েক ব্যক্তি একত্রে বসে সামষ্টিক কল্যাণ ও মঙ্গলের একটি বিশেষ মতবাদ গঠন করবে, এরপর অন্ধভাবে সব ধরনের বৈধ-অবৈধ পন্থায় জোরপূর্বক তা অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া শুরু করবে।

ইসলাম না কোন শ্রেণীর স্বার্থের ওকালতি করে আর না কোন শ্রেণীর ক্রোধ ও আক্রোশের প্রতিনিধিত্ব করে। এর ভিত্তি হল আল্লাহভীতি, ন্যায়-ইনসাফ ও সত্যকে জানার উপর এবং এসব ভিত্তির উপর সে মানুষের জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। সংস্কারের নামে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, কারো নিকট থেকে যা ইচ্ছা ছিনিয়ে আনা, যাকে খুশী কিছু দিয়ে দেয়া-এরূপ স্বেচ্ছাচারীতার কোন সুযোগ ইসলামের জীবন বিধানে নেই। একজন দায়িত্বহীন ব্যক্তি যার আল্লাহয় কোন বিশ্বাস নেই এবং কারো কাছে জবাবদিহির কোন পরোয়া নেই সে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারে যে, "আমরা সমস্ত জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথা বিলোপ করে দেবো।" সে এ কথাও বলতে পারে যে, "আমরা এসব ব্যবস্থা স্ব-অবস্থায় রেখে দেব।" কিন্তু একজন মুসলমান—যে আল্লাহভীতির খুঁটির সাথে বাঁধা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার অনুসারী সে উপরোক্ত ধরনের কোন কথা উচ্চারণ করতে পারে না। তাকে তো লক্ষ্য রাখতে হয় যে—আল্লাহর শরীয়াতের আলোকে কে জায়েয পদ্ধতিতে কোন্ জিনিসের মালিক হয়েছে আর কার মালিকানা অবৈধ। কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে আর কে তার বৈধ অধিকারের সীমালংঘন করেছে। এরপর জায়েয ও নাজায়েযের পার্থক্যের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখে সে সমস্ত বৈধ মালিকানাকে কায়েম রাখবে এবং শুধু অবৈধ প্রকৃতির মালিকানাকে খতম করে দেবে।

মনগড়া শর্ত আরোপ অবৈধ

একজন মুসলমান সংস্কারককে সর্বশেষ যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো, ইসলামের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে আমরা কোন জায়েয মালিকানার উপর নীতিগতভাবে না সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে কোন শর্ত আরোপ করতে পারি, আর না এমন কোন মনগড়া শর্ত আরোপ করতে পারি যা শরীয়াতের দেয়া জায়েয অধিকারকে কার্যত বিলোপ করে দিতে পারে। ইসলাম মানুষকে যা অনুসরণ করতে বলে তা হলো, তার কাছে যে সম্পদ আসবে তা জায়েয পথে আসবে, তা ব্যবহৃতও হবে জায়েয পদ্ধতিতে, খরচও হবে জায়েয পথে এবং আল্লাহ ও বান্দার যেসব অধিকার

এতে আরোপিত হয়েছে সে তা এ সম্পদ থেকে আদায় করবে। এরপর সে যেভাবে আমাদের বলে না যে, তোমরা বেশীর পক্ষে এত টাকা, এতটা বাড়ী, এতটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এতটা শিল্প-কারখানা, এতগুলো গবাদিপশু, এতটা মোটরগাড়ী, এতটা নৌযান, এতটা এতটা অমুক অমুক জিনিস রাখতে পারবে ; ঠিক তেমনি আমাদের এ কথাও বলে না যে, তোমরা বেশীর পক্ষে এত একর জমির মালিক হতে পারবে। পুনশ্চ সে যেভাবে আমাদের এ কথা বলে না যে, তোমরা শুধু ওই ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা বা অন্য কোন কারবারের মালিক হতে পারবে যা সরাসরি তোমরা নিজেরা চালাতে পারবে। অনুরূপ যেভাবে সে দুনিয়ার অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের উপর এই শর্ত আরোপ করেনি যে, তোমরা এমন কোন কাজের মালিকানার অধিকার রাখতে পার না যা তোমরা বেতনভুক লোক নিয়োগ করে অথবা অংশিদারীত্বের পদ্ধতিতে অন্যদের দ্বারা করিয়ে থাক। অনুরূপভাবে সে এ কথাও বলে না যে, জমির মালিক শুধু সেই ব্যক্তিই হতে পারে যে তাতে নিজে চাষাবাদ করে। লোক নিয়োগ করে বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদকারীদের জমির উপর আদৌ মালিকানার অধিকার নেই। এ ধরনের আইন তো প্রণয়ন করতে পারে শুধু স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী লোকেরা। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত তারা এরূপ কথা চিন্তাও করতে পারে না। কোন বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে যদি কিছু করা হয় তবে তা হবে বড় জোর একটি সাময়িক বিধি-নিষেধ—যা আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু এটা ইসলামী আইনের কোন মৌলিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে না।

সংস্কারের পদক্ষেপ

এ হলো সেইসব সীমারেখা—যা অতিক্রম করার অধিকার আমাদের নেই। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, ইসলামের নীতিমালা অনুসারে আমরা কোন্ প্রকারের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি—যার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার বর্তমান দোষ-ত্রুটিগুলো দূর হতে পারে এবং [illegible] ইনসাফও কায়েম হতে পারে যা ইসলামী মানদণ্ডের আলোকে বাঞ্ছনীয়।

১. জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে এটা একটা জটিল ব্যাপার যে, কোন কোন স্থানে হাজারো এমনকি লাখো একর পর্যন্ত বিস্তৃত জমি অনেক দিন থেকে মুষ্টিমেয় কতিপয় পরিবারের নিকট জায়গীর ও জমিদারী হিসেবে চলে আসছে। এসব জমির কিছু কিছু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশের উপর থাবা গেড়ে বসার পর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ মূল মালিকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে দান করেছে। আবার কিছু কিছু জমি ইংরেজ আমলেরও আগে বিভিন্ন যুগে ন্যায়-অন্যায়ভাবে বর্তমান মালিকদের পূর্ব পুরুষদের দান করা হয়েছিল। কিছু কিছু জমিদারী অবশ্য আংশিক অথবা সম্পূর্ণ নগদ মূল্যে খরিদ করাও হয়েছিল। আবার কিছু কিছু জমিদারী এমনও ছিল যা বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ বিগত শতাব্দীগুলোতে কোন সময় দখল করে নিয়েছিল। কার মালিকানা কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং তা শরীয়াত সম্মত উপায়ে হয়েছিল না নাজায়েয পন্থায়—এসব আজ এতদিন পর অনুসন্ধান করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আর এটাও এক বাস্তব সত্য যে, এত বড় ও বিস্তৃত জমিদারীর মালিকানার কারণে যার সবটাই জায়েয পন্থায় হওয়াও প্রামাণ্য ব্যাপার নয়। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কঠিন অসমতা ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে মালিকানার একটি সীমারেখা টেনে দেয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। এ সীমার অতিরিক্ত যে জমি মানুষের কাছে থাকবে তা একটি ইনসাফপূর্ণ মূল্যে খরিদ করে প্রথমে ভূমিহীন কৃষকদের নিকট ইনসাফপূর্ণ মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হবে। কিন্তু এ সীমা নির্দেশ স্থায়ী হবে না। কারণ শরীয়াতের অনেক বিধান পরিবর্তন না করে তা স্থায়ী বানানো সম্ভব নয়, আবার এটাকে স্থায়ী বিধানে পরিণত করার প্রয়োজনও নেই। কেননা, ভবিষ্যতে যদি 'ইসলাম' দেশের আইনের উৎস হয় এবং তদনুযায়ী বাস্তবে কাজও হতে থাকে তাহলে মোটেই ওই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হবে না যার নিরসনের জন্য এসব সীমারেখা টানা প্রয়োজন হয়েছে।

২. আইনগত কৃষি পেশার অবসান

দ্বিতীয়ত, এমন সব আইনের অবসান হওয়া উচিত যার কারণে আইনগতভাবে একটি স্থায়ী "কৃষিজীবী শ্রেণীর" সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

গ্রামীন সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে তাদের স্বতন্ত্র অধিকার কায়েম করে দেয়া হয়েছে এবং 'অকৃষিজীবী শ্রেণীর' জন্য 'কৃষিজীবী পেশার' সীমার মধ্যে পদচারণা করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব কিছুই ইসলামের পরিপন্থী, অযৌক্তিক এবং সেই সব অসংখ্য বেইনসাফীর উৎসে যা জায়গীরদারী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য হয়। কৃষিজ সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর থেকে সকল বিধি-নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। অন্যান্য সকল মালিকানার মত এবং স্বয়ং শহরের জমির মত গ্রামের জমির খোলাখুলী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ক্রয়ে অগ্রাধিকারের (প্রিয়েমশন) আইন যা সম্পূর্ণ অনৈসলামী ও চরম অযৌক্তিক এবং খুবই চরিত্র বিধ্বংসীরূপ পরিগ্রহ করেছে। তা বাতিল হওয়া উচিত। কৃষি পেশা অন্যান্য সকল পেশার ন্যায় আল্লাহর সকল বান্দার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। গ্রামের জীবনে জমিদারদের আইনের দৃষ্টিতে এমন কোন মর্যাদা থাকা উচিত নয় যার কারণে অন্য সকল লোক তাদের প্রজা ও কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

৩. আধুনিক কৃষি আইন প্রণয়ন

তৃতীয়ত, এমন একটি কৃষি আইন প্রণীত হওয়া উচিত যার দ্বারা জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যকার সম্পর্ককে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ বুনিয়াদের উপর কায়েম করা যেতে পারে। বর্গা চাষাবাদ হলে একে সরাসরি অংশীদারীত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং আইনের আলোকে এ কথা চূড়ান্ত হতে হবে যে, বর্গা চাষাবাদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে মালিক ও কৃষকের মধ্যে বেশীর পক্ষে ও কমের পক্ষে কি কি হারে অংশ বন্টিত হতে পারে। নগদ ভাড়ায় হোক অথবা শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করানো হোক—এ ক্ষেত্রেও মালিক ও ভাড়া গ্রহীতার মধ্যে এবং মালিক ও মজদুরের মধ্যে হকুক ও ফারাযেজ (অধিকার এবং দায়িত্ব) নির্ধারিত হয়ে যেতে হবে।[১]

১. যদিও এ ব্যাপারগুলোকে শরীয়াত প্রচলিত প্রথা ও পারস্পরিক সমঝোতার উপর ছেড়ে দিয়েছে—কিন্তু যেখানে যুলুমের অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার এবং সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করে যুলুমের উৎখাত করার অধিকার রয়েছে।

এ কথাও চূড়ান্ত হয়ে যেতে হবে যে, জমির মালিকগণ কৃষকদের নিকট হতে নিজেদের অংশ অথবা বর্গা ছাড়া অতিরিক্ত কোন মাল বা শস্য অথবা শ্রম গ্রহণ করতে পারবে না। অবৈধভাবে এ ধরনের শ্রম গ্রহণ অথবা জিনিসপত্র অথবা জবরদস্তিমূলকভাবে চাপানো প্রথাগত অধিকার আদায় করাকে পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া উচিত। বেদখল ও চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে নীতিমালা সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যে, কি কি অবস্থায় তা হতে পারে আর কোন্ কোন্ অবস্থায় তা হতে পারে না। অনন্তর ইসলামী শরীয়াতের বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী জমি অনাবাদী ফেলে রাখার উপরও বিধি–নিষেধ আরোপিত হওয়া দরকার। যেমন আমি আগেও বর্ণণা করেছি যে, 'মাওয়াত' (পতিত জমি) ও রাষ্ট্র প্রদত্ত জমির ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়াতের বিধানেই ব্যবস্থা আছে যে, তিন বছরের অধিক সময় যদি কেউ জমি বেকার ফেলে রাখে তাহলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। আর টাকা দিয়ে কেনা জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে যদিও মালিকানা খতম হয়ে যায় না, কিন্তু এভাবে ফেলে রাখলে শাস্তিমূলক কোন কর আরোপ করা যেতে পারে। যাতে আল্লাহর কোন বান্দাকে এতে কাজ করার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে জমির মালিকদের কৃষকদেরকে ইচ্ছামত শর্তে রাজী করানোর এবং কৃষকরা রাজী না হলে জমি ফেলে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৪. শরয়ী পদ্ধতিতে মীরাস বন্টন

চতুর্থত শরীয়াতের মিরাসী আইন কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রেও পূর্ণ শক্তিতে কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমান বংশধরদের মধ্যে যেসব লোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে হকদার, যদি তাদের মধ্যে মীরাস বন্টনকে আবশ্যকীয় করা হয়, তাহলে অনেক বড় বড় জমিদারী যা পুরনো জাহেলী প্রথার কারণে এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা হকদার লোকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে। এভাবে সম্পদ এক জায়গা হতে সরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ার ধারা শুরু হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে যে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, জমি এত ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হবে যা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাজের উপযুক্ত থাকবে না, এ আশংকা আদৌ ঠিক নয়। আপনারা জমির ক্রয়–বিক্রয়ের উপর থেকে অযথা বাধা বিপত্তিগুলো তুলে দিন। চাষাবাদের জন্য উত্তম ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি

নির্ধারণ করুন। যৌথ চাষাবাদের (Co-operative farming) পদ্ধতি চালু করুন। এরপর চাই উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে জমি ভাগ হতে হতে টুকরা টুকরা হয়ে এক গজেই রূপান্তরিত হোক না কেন—তাতে জমির এসব টুকরা অকেজো পড়ে থাকার অবস্থার সৃষ্টি হবে না। যেসব লোকের নিকট এসব ছোট ছোট টুকরা থেকে যাবে তারা সহজেই নিজ নিজ অংশ বিক্রি করতে পারবে, অথবা অন্যের অংশ খরিদ করতে পারবে, অথবা সংগত শর্তে চাষাবাদের জন্য দিতে পারবে, অথবা যৌথভাবে চাষাবাদে শরীক হতে পারবে।

৫. উশর আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা

পঞ্চমত শরীয়াতের হুকুম মোতাবেক কৃষি উৎপাদনের উপর উশর ও জমিদারের গবাদি পশুর যাকাত যথারীতি আদায়ের ব্যবস্থাও থাকতে হবে এবং তা শরীয়াত অনুমোদিত খাতে খরচ হতে হবে। এর বিস্তারিত আলোচনা আমি ইনশাআল্লাহ আমার "যাকাত" পুস্তিকায় করবো। এখানে শুধু এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট যে, ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী ইনসাফ কায়েম করাও জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার পরিবর্তে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এটা একটা অত্যাবশ্যকীয় প্রচেষ্টা, যার উপকারিতা অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যেতে পারে না।

এই হচ্ছে আসল লক্ষ্য—যেদিকে আমাদের সংশোধনমূলক প্রচেষ্টার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। এখানে আমি সব সম্ভাব্য পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করিনি। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞজন এর সাথে আরো অধিক প্রস্তাবনা সংযোজন করতে পারেন। এখানে শুধু এটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টার সঠিক পথ ওটা নয় যেদিকে কলম ও কদম চলছে। বরং পথ এটা যে দিকে ইসলাম আমাদেরকে পথ দেখায়।

اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ –